জিহাদে কাশ্মীর এবং বালআম বিন বাউরার উত্তরসূরিদের বিভ্রান্তির অপপ্রয়াস- ১

ইদানিং কাশ্মীর জিহাদ নিয়ে আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া সাহেবের বক্তব্য আশাকরি সকলেই শুনে থাকবেন। তার বক্তব্যের সারকথা:

[জিহাদ একটি মুনাজ্জাম ও শৃংখলাবদ্ধ কাজ। এলোপাথারি মারামারি করে মরে যাওয়াই জিহাদ নয়। আর শৃংখলাবদ্ধভাবে জিহাদ করতে হলে জিহাদের স্থান লাগবে, নিয়মিত সেনাবাহিনি লাগবে, কুদরত তথা শত্রুর সাথে পেরে উঠার সামর্থ্য লাগবে। সাধারণ ব্যক্তিদের দ্বারা এমন শৃংখলাবদ্ধ জিহাদ সম্ভব নয়, এর জন্য রাষ্ট্র লাগবে। রাষ্ট্রীয় ঘোষণার দ্বারা জিহাদ করতে হবে। জিহাদ করবে রাষ্ট্রের সেনাবাহিনি। সাধারণ মানুষ জিহাদে যাবে না। তবে যদি সেনাবাহিনি সাধারণ মানুষদের যেতে বলে তাহলে যাবে। কারণ, সেনাবাহিনি তখন তাদেরকে প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দেবে। অন্যথায় সাধারণ মানুষ যাওয়া আত্মহত্যার শামিল। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ছাড়া তাদের জন্য জিহাদে যাওয়া হারাম

হবে। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত সরকার জিহাদে যাওয়ার ডাক না দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দেশের মুসলমানদের জন্য কাশ্মীর বা এ জাতীয় কোন ভূখণ্ডে যাওয়া হারাম।]

উপরোক্ত কথাটি (যদিও তাতে বেশ কিছু ভুল আছে তথাপি) এক পর্যায়ে মেনে নেয়ার মতো। কারণ, জিহাদ আসলে একটা জামাতবদ্ধ কাজ। এর জন্য একটা উপযুক্ত ময়দান এবং সুশৃংখল ব্যবস্থাপনা না থাকলে তেমন ফলপ্রসূ হয় না। এটা অস্বীকার করার মতো নয়। এ জন্যই মুজাহিদিনে কেরাম যার তার কথায় কোন ভূমিতে রওয়ানা দিতে নিষেধ করেন। বরং মুজাহিদদের নিয়ম হল, প্রত্যেকে আপন ভূমিতে থেকে জিহাদ করবে। কখনও প্রয়োজন পড়লে বাহিরে যাবে। ঢালাওভাবে সকলে হিজরত করে অন্য ভূমিতে চলে যাওয়া আন্তর্জাতিক উমারাদের নিয়ম বহির্ভূত। যাহোক, কথাটা এক পর্যায়ে মেনে নেয়ার তবে। তবে তার পুরো বক্তব্য থেকে পরিষ্কার যে, তার এ আশঙ্কা শুধু একটা আশঙ্কা নয়, বরং অনেকগুলো ভ্রান্ত আকিদার নাতিজা-ফলাফল। **যেমন, আমাদের দেশের মুসলমান যুবকদের জন্য**

কাশ্মিরে যাওয়া হারাম হওয়ার কারণ বলেছেন,

- রাষ্ট্রপ্রধান তাদেরকে অনুমতি দেয়নি।

- কাশ্মীরে জিহাদের জন্য কোথাও থেকে কোনো ডাক আসেনি। এমনকি তিনি দাবি করেছেন যে, বর্তমান বিশ্বে কোথাও জিহাদের ডাক নেই।

- কাশ্মীরিরা জিহাদে দাঁড়ায়নি। আর যখন তারা না দাঁড়াবে তখন আমাদের উপর তাদের সাহায্য করার দায়িত্ব নেই। তারা যখন দাঁড়াবে এবং দাঁড়ানোর পর মোকাবেলা করতে অক্ষম হয়ে যাবে, তখন অন্যরা যেতে পারবে, নতুবা হারাম হবে।

- কাশ্মীরিরা দাঁড়ালেও তারা না পারলে প্রথম ফরয হতো পাকিস্তানীদের উপর। আমরা যারা দূরে আছি, তাদের জন্য যাওয়া হারাম হবে। এটা আত্মহত্যার শামিল।

- কাশ্মীরে জিহাদ দাঁড়ালে, তারা না পারলে, এমনকি আশপাশের মুসলমানরাও না পারলে তখন আমরা যেতে পারবো। তবে আমাদের মধ্যে কেবল সে সকল লোকই যাবে

যারা সামরিক ট্রেনিং প্রাপ্ত। সাধারণ মানুষ কখনও জিহাদে যাবে না। অবশ্য তিনি সামনে গিয়ে এর বিপরীত কথা বলেছেন যে, নিয়মতান্ত্রিক সেনাবাহিনি যদি সাধারণ মানুষকে যেতে বলে তাহলে তারা যাবে। সেনাবাহিনি তাদেরকে ট্রেনিং দেবে।

- যারা কাশ্মীরে যাওয়ার জন্য বলছে, তারা নিজেরা জিহাদে যায় না। অন্যদেরকে যেতে বলে নিজেরা বসে থাকে। এরা নিজেদের সুনাম বাড়ানোর জন্য জিহাদের কথা বলছে। এরা ধান্দাবাজ- ফেতনাবাজ। এদের কথা শুনা জায়েয হবে না।
- কাশ্মীরে কারা জিহাদ করছে তা জানা নেই। আর হাদিসে এসেছে, ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية "যে ব্যক্তি এমন ঝাণ্ডা তলে যুদ্ধ করে যা হক না বাতিল জানা নেই, যে তার আপন গোত্রের স্বার্থে ক্রোধান্বিত হয় কিংবা গোত্রের দিকে আহবান করে বা অন্যায়ভাবে গোত্রের সহায়তা করে আর এভাবেই মারা যায়, তাহলে সে জাহিলী মরা মরল।"- মুসলিম: ৪৮৯২

এছাড়াও আরও অনেক কিছু বলেছেন। সংক্ষেপে একটু গুছিয়ে বলতে গেলে এভাবে বলা যায়-

[কোন মুসলিম ভূখণ্ডে কাফেররা আগ্রাসন চালালে প্রথমত যাদের উপর আক্রমণ হয়েছে মোবাবেলা করা তাদের উপর ফরযে আইন- যদি মোকাবেলার সামর্থ্য তাদের থাকে। মোকাবেলার সামর্থ্য না থাকলে ফরয নয়। তখন হয়তো হিজরত করবে, নয়তো সবর করবে (তথা মার খেতে থাকবে)। আর সামর্থ্যের মাপকাটি হল, কাফেরদের সংখ্যা মুসলমানদের ডবলের চেয়ে বেশি না হওয়া।

আক্রান্ত মুসলমানরা যদি জিহাদে না দাঁড়ায়, তাহলে তাদেরকে সাহায্য করা এবং তাদের হয়ে জিহাদ করা বাহিরের মুসলামনদের দায়িত্ব নয়। বাহিরের মুসলমানদের উপর তখনই জিহাদ ফরয হবে, যখন আক্রান্তরা কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তি তথা আমীরের অধীনে মোকাবেলায় দাঁড়াবে। যখন তারা আমীরের অধীনে দাঁড়াবে এবং মোকাবেলা করতে অক্ষম হয়ে পড়বে তখনই কেবল বাহিরের

মুসলমানদের উপর ফরয হবে, অন্যথায় নয়।

যদি তারা কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তি তথা আমীরের অধীনে মোকাবেলায় দাঁড়ায় কিন্তু মোকাবেলা করতে সক্ষম না হয়, তাহলে পার্শ্ববর্তী মুসলমান রাষ্ট্রের সকলের উপর জিহাদ ফরয হবে না, কেবল সেনাবাহিনির উপর ফরয হবে। সাধারণ জনগণের উপর ফরয হবে না। তবে সেনাবাহিনি যদি সাধারণ জনগণকে যেতে বলে তাহলে যাবে এবং সেনাবাহিনি তাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করবে।

পার্শ্ববর্তীরা যদি জিহাদে যায় এবং তারাও মোকাবেলা করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, তাহলে দূরবর্তীদের উপর জিহাদ ফরয। পার্শ্ববর্তী দেশের মুসলমানরা যদি জিহাদে না যায়, তাহলে দূরবর্তী দেশগুলোর মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরয নয়। (শায়খ যদিও কথাটি এত পরিষ্কার করে বলেননি, তবে বয়ান থেকে কথাটি স্পষ্ট।)

তবে সেনাবাহিনি হোক, সাধারণ মুসলমান হোক, পার্শ্ববর্তী

হোক বা দূরবর্তী হোক: তাদের জন্য তখনই জিহাদে যাওয়া জায়েয হবে, যখন রাষ্ট্র প্রধান অনুমতি দেবে। রাষ্ট্র প্রধান অনুমতি না দিলে জিহাদে যাওয়া হারাম।]

এককথায়, সব বিভ্রান্তির গোঁড়া হল, ইমাম। শায়খের মতে জিহাদ ফরয হওয়ার জন্য ইমাম, ইমামের আহ্বান ও অনুমতি লাগবে। যারা আক্রান্ত হয়েছে, তাদেরও একজন ইমাম লাগবে; আর বাহিরের মুসলমান যারা জিহাদে যেতে চাচ্ছে তাদেরও তাদের ইমাম তথা রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতি লাগবে। অবশ্য তিনি এতটুকু ব্যবধান করেছেন যে, যারা বাহিরের তাদের জন্য তো নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র প্রধান লাগবে; কিন্তু যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদের জন্য এমন রাষ্ট্র প্রধান লাগবে না। অন্তত জিহাদে অভিজ্ঞ এমন কোন ব্যক্তির অধীনে জিহাদে দাঁড়াতে হবে। যদি তারা জিহাদে দাঁড়ায় তাহলেই কেবল বাহিরের মুসলমানদের জন্য এখানে এসে জিহাদ করা জায়েয হবে, অন্যথায় যদি তারা শুধু মারই খেতে থাকে, অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তির অধীনে জিহাদে না দাঁড়ায়,

তাহলে বাহিরের মুসলমানদের জন্য তাদেরকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসা জায়েয নয়, হারাম। কারণ, যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদের কোন ইমাম নেই।

দ্বিতীয়ত যদি তারা কোন আমীরের নেতৃত্বে দাঁড়ায়ও এবং অক্ষম হয়ে মারও খেতে থাকে, তথাপি বাহিরের মুসলমানদের জন্য তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসা ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম, যতক্ষণ না তাদের রাষ্ট্র প্রধান তাদেরকে অনুমতি দেয়।

এর দলীল তিনি দিয়েছেন নিচের হাদিসটি দিয়ে-

إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به

“ইমাম হচ্ছেন ঢালস্বরূপ। তার পেছনে থেকে যুদ্ধ করা হবে এবং তার দ্বারা আত্মরক্ষা করা হবে।”- বুখারি ২৭৯৭, মুসলিম ১৮৪১

অতএব, যাদের উপর আক্রমণ হয়েছে তাদেরও একজন ইমাম লাগবে, আর বাহিরের মুসলমান যারা যাবে, তাদেরও ইমামের অনুমতি লাগবে। এ হাদিসের আলোচনা আমরা

সামনে করবো ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য, শায়খ বলেছেন, যাদের উপর আক্রমণ হয়েছে তাদের উপর জিহাদ তখনই ফরয হবে, যখন শত্রু প্রতিহত করার কুদরত তাদের থাকবে। এর মাপকাটি তিনি বুঝাচ্ছেন, শত্রু সংখ্যা মুসলমানদের দ্বিগুণের বেশি না হওয়া। দ্বিগুণের বেশি হলে কুদরত নেই ধরা হবে। তখন আর ফরয থাকবে না। ধরলাম ফরয নয়, তাহলে অন্তত প্রতিরোধ করা জায়েয হবে কি'না? এ ব্যাপারে তিনি স্পষ্ট কিছু না বললেও যতটুকু বুঝা যায়, তার মতে এমতাবস্থায় প্রতিরোধ করা হারাম হবে। কেননা, এটা 'ইলক্বাউন নাফস ইলাততাহলুকা' তথা আত্মহত্যার শামিল। শায়খের আরেকটা কথা থেকে এমনটা বুঝা যায়। তাহ হল, শায়খ যখন বলেছিল, রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতি না হলে জিহাদে যাওয়া হারাম, তখন একজন সূরা নিসার নিম্নোক্ত আয়াত দিয়ে এর আপত্তি করেছিল-

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾

"তোমাদের কী হলো! তোমরা কিতাল করছো না আল্লাহর রাস্তায় এবং অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য? যারা বলে, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে বের করে নিন এ জনপদ থেকে, যার অধিবাসীরা যালিম। আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে কোনো অভিভাবক নির্ধারণ করে দিন এবং নিযুক্ত করে দিন আপনার পক্ষ থেকে কোনো সাহায্যকারী।"- নিসা ৭৫

আপত্তি করেছিল যে, এ আয়াতে তো রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতি লাগবে বলা হয়নি। তখন তিনি আজগুবি একটা জওয়াব দিয়েছেন। সাথে এও বলেছেন, দুর্বলদেরকে তো একথা বলা হয়নি যে, তোমরা জিহাদ শুরু কর। তাদেরকে সবর করতে বলা হয়েছে।

শায়খের এ কথা এবং আগের কথা মিলালে বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি বুঝাচ্ছেন, দুর্বলদের জন্য জিহাদ করা হারাম। এটা আত্মহত্যার নামান্তর। এছাড়াও আরো বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে তিনি বিষয়টি বুঝানোর পায়তারা করেছেন। যদি এমনটাই হয়, তাহলে শায়খের এ দাবি নির্জলা মিথ্যা। কারণ, আয়াতে তো এ কথা বলা হয়নি যে, ‘তোমরা মার খেয়ে যাও, তবুও জিহাদ শুরু করবে না। তোমরা দুর্বল। জিহাদ শুরু করা তোমাদের জন্য হারাম হবে’। বেশির চেয়ে বেশি একথা বলা যায়, দুর্বলদের জন্য জিহাদ ফরযে আইন করা হয়নি। তাই না করার অনুমতি আছে। কিন্তু করলে হারাম হবে একথা তো বলা হয়নি। বরং করাটাই প্রশংসনীয়। মার খেয়ে খেয়ে ধুকে ধুকে মরার চেয়ে, ইজ্জত-আব্রু হারিয়ে মরার চেয়ে যুদ্ধ করে মরে যাওয়া প্রশংসনীয়। এ ব্যাপারে ইনশাআল্লাহ আমরা সামনে আলোচনা করবো।

অধিকন্তু দুর্বলদের জন্য জিহাদ না করে থাকার অনুমতি আছে কথাটা ঢালাওভাবে সহীহ নয়। কাফেররা আপনাকে,

আপনার সামনে আপনার ছেলে-মেয়ে, মা-বাপা ও ভাই-বোনকে নির্যাতন ও হত্যা করছে আর আপনি শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবেন? কিছুই করবেন না? এটার অনুমতি শরীয়ত দেয় না। সামর্থ্যে যতটুকু আছে আপনাকে করতে হবে। বসে বসে মার খেয়ে খেয়ে, নিজের ইজ্জত-আব্রু হারিয়ে মরার অনুমতি শরীয়ত দেয় না। সামনে ইনশাআল্লাহ এর আলোচনা করবো।

আর শায়খ শত্রু সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি হলেই যে জিহাদ ফরয নয় বলেছেন, সেটা মূলত তার অজ্ঞতার ফল। আহযাবের যুদ্ধে যখন কুরাইশরা আরবের বড় বড় কয়েকটি কাফের গোত্র এবং মদীনার ইয়াহুদিদের সমন্বয়ে বহুজাতিক বাহিনি গঠন করে মদীনা অবরোধ করেছিলে, তখন কি কাফেরদের সংখ্যা মুসলমানদের দ্বিগুণের চেয়েও বেশি ছিল না? তখন কি জিহাদ ফরযে আইন ছিল না? না'কি হারাম ছিল? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের নিয়ে যে প্রতিরোধ করেছেন তা কি হারাম করেছেন? শায়খ আপনি কি বলছেন? আপনার মাথা ঠিক আছে তো? আমার

মনে হয় শায়খ কি যে বলেন তা চিন্তা করেন না। মুখে যা আসে বলে দেন। এজন্য শায়খের আগে পিছে কথার মধ্যে অনেক গড়মিল দেখা যায়। ২০ মিনিটের দু’টো বয়ানে মধ্যেও শায়খের অনেক গড়মিল আছে। বরং বলতে গেলে শায়খের প্রতিটি কথাতেই একেকটি মহা বিভ্রান্তি লুকায়িত। সব আলোচনা করতে গেলে বিশাল কিতাব লিখতে হবে। আলোচনা সংক্ষেপ করতে চাচ্ছি।

***

তাহলে এখন মুসলমানদের করণীয় কি? বাইরের মুসলামানদের করণীয় বলেছেন, দোয়া করা এবং যাদেরকে বললে কাজ হবে তাদেরকে বলা। এর বাইরে কোন কাজ নেই। এমনকি কাশ্মীরিদের দাবিতে মিছিলও করতে তিনি নিষেধ করেছেন।

দোয়ার বিষয়টা মেনে নিলাম। মুসলমানের বিপদে অন্য মুসলমান দোয়া করবে এটাই তো ভ্রাতৃত্বের দাবি। এতে আপত্তি নেই। আপত্তি হলো, দোয়া ছাড়া আর কিছু করণীয় আছে কি’না- সেটা নিয়ে।

তিনি দোয়া ছাড়া আর করণীয় বলেছেন, **'যাদেরকে বললে কাজ হবে তাদেরকে বলা'।** এর দ্বারা তিনি মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর তাগুত শাসকগোষ্ঠী, অন্যান্য কাফের রাষ্ট্রের শাসকদের বুঝিয়েছেন। জাতিসংঘকেও হয়তো বুঝিয়ে থাকবেন। কিন্তু তাদের কাছে যদি বলা না যায় (বিশেষত যখন তিনি মিছিল করতেও নিষেধ করেছেন তখন বলার আর কি সূরত বাকি রইল? আর শাসকগোষ্ঠীর কাছে দাবি নিয়ে পৌঁছা যে মোটামুটি অসম্ভব আশাকরি বর্তমানে কারো কাছে অস্পষ্ট নয়; আর পৌঁছতে পারলেও তাতে সমূহ বিপদের আশঙ্কা); কিংবা বলার পর যদি তারা কোন কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তাহলে কি করণীয় তা তিনি বলেননি। তবে তিনি এতটুকু বলেছেন, বাংলাদেশ সরকার যদি ভারতের পক্ষ হয়ে কাশ্মীরিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে ভারতের পক্ষে যোগ দেয়া আমাদের জন্য জায়েয হবে না। সাথে এ কথাও বলেছেন যে, বাংলাদেশ সরকার ভারতকে সমর্থন করে যাচ্ছে। **তবে আরো কিছু প্রশ্ন তিনি এড়িয়ে গেছেন, যেগুলো বর্তমান পরিস্থিতিতে আরো গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যেমন,**

- সরকার যখন কুফরের পক্ষ নিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে তখন সরকারের কি বিধান? সে মুসলমান থাকবে কি’না বা তার আনুগত্য জরুরী কি’না বা সে আমীরুল মু’মিনীন হিসেবে বহাল থাকবে কি’না (যেমনটা তারা বর্তমানে সরকারকে আমীরুল মু’মিনীন মনে করে থাকে এবং তার আনুগত্য ফরয বলে থাকে)?

- সরকার যদি নিজেও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে এবং জিহাদেরও অনুমতি না দেয় তখন মুসলমানদের কি করণীয়?

- সরকার যদি ভারতের পক্ষে যোগ দেয়, তাহলে এদেশের মুসলমানদের কি করণীয়?

এসব প্রশ্ন তিনি এড়িয়ে গেছেন।

***

ফতোয়ার নাতিজা-ফলাফল

শায়খের ফতোয়া অনুযায়ী ফলাফল কি দাঁড়াচ্ছে একটু লক্ষ করি:

শায়খ বলেছেন, কাশ্মীরে যে পরিমাণ হিন্দু সৈন্য আছে এবং তাদের যে পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র আছে, তার সামনে কাশ্মীর মুসলমানদের দাঁড়ানোর সামর্থ্য নেই। এমনকি এও বলেছেন, বাংলাদেশের অর্ধেক মানুষ কাশ্মীরে চলে গেলেও কিছু করতে পারবে না। এতই যখন দুর্বল, তখন কাশ্মীরিদের জন্য জিহাদে দাঁড়ানো আত্মহত্যার শামিল। শায়েখের ফতোয়া অনুযায়ী (যদি আমি শায়খের কথা সঠিক বুঝে থাকি) কাশ্মীরিদের জন্য জিহাদে দাঁড়ানো হারাম। কিংবা অন্তত ফরয নয়। আর শায়খ বলেছেন, কাশ্মিরিরা জিহাদে দাঁড়ায়নি। মোটকথা দাঁড়ানো হারামই হোক কিন্তু এমনটাই হয়ে থাকুক যে, তারা দাঁড়ায়নি- সর্বাবস্থায় বহির্বিশ্বের মুসলমানদের জন্য কাশ্মিরে যাওয়া হারাম। কারণ, এক দিকে তারা নিজেরা যখন দাঁড়ায়নি (যদিও শায়খের এ বক্তব্য সঠিক নয়, বরং কাশ্মিরিরা টুকটাক হলেও জিহাদ করে যাচ্ছে) তখন শায়খের দরবারি ফতোয়া অনুযায়ী তাদেরকে সাহায্য করা বাকি মুসলমানদের দায়িত্ব নয়। অধিকন্তু পাকিস্তান যেহেতু এগিয়ে যায়নি, তাই আমাদের কোন দায়িত্ব

নেই। সর্বোপরি রাষ্ট্রপ্রধানের যেহেতু অনুমতি হয়নি, তাই বাহিরের মুসলমানদের জন্য কাশ্মিরে সহায়তা করতে যাওয়া হারাম। অতএব, এখন যদি গোটা কাশ্মীরকে মৃত্যুপুরীও বানানো হয়; কাশ্মীরের নারী, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ সকলকেও যদি ধরে ধরে যবাই করা হয় বা বোম্বিং করে উড়িয়ে দেয়া হয়; যদি মা-বোনদের আহাজারিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিতও হয়, যদি তাদের প্রতি দরদে হৃদয় ফেঁটে টুকরো টুকরোও হয়ে যায়, তথাপি আমাদের জন্য এবং বিশ্বের সকল মুসলমানের জন্য জিহাদে যাওয়া হরাম! হারাম! হারাম! কাঁদতে পারবেন, দোয়া করতে পারবেন, জিহাদ করতে পারবেন না। এমনকি মিছিলও করতে পারবেন না। করলেই হারাম হবে। জাহান্নামে যেতে হবে। আল্লাহর সামনে কেয়ামতের দিন জবাবদিহি করতে হবে- কেন তুমি রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতি ছাড়া জিহাদে গেলে? তাগুতদের কথা মতো কেন ঘরে বসে থাকলে না? কেন কাশ্মীরিদের নীরবে হত্যা করতে দিলে না? কেন মালউনদেরকে বাধা দিলে? আরো হাজারো জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে!!

এই হল ফতোয়ার সারকথা। বাহ! অনেক সুন্দর ফতোয়া।

এ ধরণের সরকারি ফতোয়া দেয়ার জন্যই বালআম বিন বাউরার উত্তরসূরি কুকুরদেরকে রুটি আর উচ্ছিষ্ট দিয়ে তাগুতগোষ্ঠী পোষে যাচ্ছে। না হলে তাদের কি-ই বা দরকার পড়েছে যে, এদেরকে তারা পোষে যাবে- যদিও তা উচ্ছিষ্ট দিয়েই হোক না কেন!!

(চলমান ইনশাআল্লাহ)

জিহাদে কাশ্মীর এবং বালআম বিন বাউরার উত্তরসূরিদের বিভ্রান্তির অপপ্রয়াস-০২

উপরে আমরা দরবারি ফতোয়াটি দেখেছি। এবার একটু পর্যালোচনায় যাব। শায়খের সংশয়গুলোর উপর একটু আলোকপাত করবো ইনশাআল্লাহ।

প্রথমে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, সুবিধাবাদিরা কাফের-মুরতাদদের পক্ষে যতই ওকালতি করুক; যতই তাবিল, তাহরিফ ও অপব্যাখ্যা করুক- আল্লাহ তার দ্বীনকে বিজয়ী করবেনই। আল্লাহ তাআলার চিরসত্য ওয়াদা-

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (32) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (33)

"ওরা আল্লাহর নূরকে নিজেদের মুখের (ফুঁ) দ্বারা নিভিয়ে দিতে চায়, অথচ আল্লাহ তার নূরের পূর্ণনা বিধান ব্যতীত বাকি সকল কিছুতেই অসম্মত- যদিও কাফেররা (তা) অপছন্দ করে। তিনিই তো সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি সকল দ্বীনের উপর তাকে বিজয়ী করেন- যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।"- তাওবা ৩২-৩৩

♣ সংশয়: ইমামের অনুমতি

এ ব্যাপারে কিছু আলোচনা আগেও হয়েছে। তবে শায়খের বক্তব্য যেহেতু নতুন করে ফিতনার সৃষ্টি করেছে তাই কিছু আলোচনা সমীচিন করছি। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

সরকারি মোল্লারা মূলত কথার একাংশ বলে আরেকাংশ বাদ দিয়ে ফিতনার সৃষ্টি করে। পূর্ণ কথাটি বললে তখন সকলেই সঠিক বিষয়টি বুঝতে পারতো। **ইমামের আনুগত্য আমরা অস্বীকার করি না, ফরয মনে করি।** যেমনটা আল্লাহ তাআলা আদেশ দিয়েছেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আদেশ মান্য কর এবং আদেশ মান্য কর রাসূলের ও তোমাদের মধ্যে যারা দায়িত্বশীল, তাদের।"- নিসা ৫৯

কিন্তু এ আনুগত্য দু’টি শর্ত সাপেক্ষে:

প্রথম শর্ত:

ইমাম মুসলমান হতে হবে। কাফের কখনও মুসলমানদের ইমাম হতে পারে না। যেমনটা এ আয়াতেও বলা হয়েছে (مِنْكُمْ) তথা ইমাম মুসলমান হতে হবে। **শায়খ আব্দুল্লাহ আদদুমাইজি বলেন,**

فقوله تعالى (منكم) نص على اشتراط أن يكون ولي الأمر من المسلمين ، قال د . محمود الخالدي : [ولم ترد كلمة (أولي الأمر) إلا مقرونة بأن يكونوا من المسلمين ، فدل على أن ولي الأمر يشترط أن يكون مسلما]. اهـ

“আল্লাহ তাআলার বাণী (منكم)- ‘তোমাদের মধ্য থেকে’ সুস্পষ্ট ভাষ্য যে, উলূল আমর মুসলমানদের মধ্য থেকে হওয়া শর্ত। ডক্টর মাহমুদ আলখালিদি বলেন, ‘(উলূল আমর) শব্দটি যত জায়গায় এসেছে, সব খানেই (মুসলমানদের মধ্য থেকে হওয়া) কথাটির সাথে মিলে এসেছে। বুঝা গেল, উলূল আমর মুসলমান হওয়া শর্ত’।”- আলইমামতুল উজমা ১৫৭

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন,

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

‘আল্লাহ কিছুতেই কাফেরদের জন্য মু’মিনদের বিরুদ্ধে কোন পথ রাখবেন না।’- নিসা: ১৪১

ইবনুল হুমাম রহ. (৮৬১ হি.) বলেন,

لا ولاية لكافر على مسلم لقوله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141]. اهـ

“কোন মুসলমানের উপর কোন কাফেরের কোন কর্তৃত্ব নেই। কেননা, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- ‘আল্লাহ কিছুতেই কাফেরদের জন্য মু’মিনদের বিরুদ্ধে কোন পথ রাখবেন না’।”- ফাতহুল কাদীর: ৫/২৬৫

দ্বিতীয় শর্ত:

আদেশ বা নিষেধ শরীয়তসম্মত হতে হবে। শরীয়ত পরিপন্থী আদেশ-নিষেধে কোন আনুগত্য নেই। যেমনটা হাদিসে এসেছে যে, **রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,**

« على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ».

“পছন্দ-অপছন্দ সকল বিষয়ে মুসলমানের জন্য শ্রবণ ও আনুগত্য আবশ্যক। তবে যদি গুনাহের আদেশ করা হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। গুনাহের আদেশ করা কোন হলে শ্রবণ বা আনুগত্য নেই।”- মুসলিম ৪৮৬৯, বুখারি ৬৭২৫

এটাই আমাদের আকীদা। যেমনটা **ইমাম ত্বহাবি রহ. (৩২১হি.) আহলুস সন্নাহর আকীদায় লিখেছেন,**

ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز و جل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. اهـ

“আমরা আমাদের আইম্মা ও আমাদের দায়িত্বশীলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়েয মনে করি না- যদিও তারা জুলুম করে। তাদের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করি না। আনুগত্যের হাতও গুটিয়ে নিই না। (বরং) তাদের

আনুগত্যকে আল্লাহ আযযা ওয়াজাল্লাহ-এর আনুগত্য মনে করি ও ফরয মনে করি- যতক্ষণ তারা কোনো গুনাহের আদেশ না দেন।”- আলআকিদাতুত ত্বহাবিয়্যাহ ৪৭

***

শর্তের ব্যতয় ঘটলে

উপরোক্ত দুই শর্তের কোন একটায় ব্যাত্যয় ঘটলেই হুকুম বিপরীত হবে।

যদি প্রথম শর্তে ব্যত্যয় ঘটে তথা ইমাম মুসলমান না থাকে, তাহলে শরীয়তের নিদের্শ: যুদ্ধ করে হলেও তাকে অপসারণ করে দিতে হবে। যেমনটা হাদিসে এসেছে যে, হযরত উবাদ ইবনু সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ. فكان فيما أخذ علينا أَنْ بَايَعَنَا على السمع والطاعة في مَنشَطِنا ومَكْرَهِنا، وعُسرنا ويُسرنا، وَأَثَرَة علينا، وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَه. قَالَ: إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ. (متفق عليه وهذا لفظ مسلم.)

“আমাদেরকে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডাকলেন এবং আমরা তাঁর হাতে বাইআত হলাম। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের থেকে যে বিষয়ে বাইআত নিলেন তার মধ্যে একটি ছিল: আমরা আমাদের পছন্দনীয়-অপছন্দনীয় সকল বিষয়ে, সুখে-দুঃখে এবং আমাদের উপর যদি অন্য কাউকে প্রাধান্য দেয়া হয় তথাপি (আমীরের কথা) শুনবো ও আনুগত্য করবো এবং আমরা দায়িত্বশীলের সাথে দায়িত্ব নিয়ে বিবাদে জড়াবো না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন তবে হ্যাঁ, যদি তোমরা কোন স্পষ্ট কুফর দেখতে পাও,

যার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে- তাহলে ভিন্ন কথা।”- সহীহ বোখারি: ৬৬৪৭, সহীহ মুসলিম: ৪৮৭৭

এটি মুসলিম উম্মাহর ইজমায়ী তথা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। **ইমাম নববি রহ. (৬৭৬ হি.) কাজি ইয়াজ রহ. (৫৪৪ হি.) এর বক্তব্য বর্ণনা করেন,**

قال القاضي عياض: أجمع العلماءُ على أن الإمامةَ لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفرُ انعزل. اهـ

“উলামায়ে কেরাম সবাই একমত যে, কোনো কাফেরকে খলিফা নিযুক্ত করলে সে খলিফা হবে না এবং কোনো খলিফার মাঝে যদি কুফরী প্রকাশ পায়, তাহলে সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপসারিত হবে যাবে।”- শরহে নববি আলা মুসলিম ১২/২২৯

আরো বলেন,

قال القاضي: فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته. اهـ

“কাজী ইয়ায রহ. আরও বলেন, শাসকের উপর যদি কুফর আপতিত হয় এবং সে যদি শরীয়া বিনষ্ট করে অথবা বিদআত করে, তবে সে পদচ্যুত হয়ে যাবে এবং তার আনুগত্যের অপরিহার্যতা শেষ হয়ে যাবে।”- শরহে নববি আলা মুসলিম ১২/২২৯

হাফেয ইবনে হাজার রহ. (৮৫২ হি.) বলেন,

يَنعَزِلُ بالكفر إجماعا فيجبُ على كل مسلمٍ القيامُ في ذلك، فمن قَوِيَ على ذلك فله الثوابُ، ومن داهن فعليه الإثمُ، ومن عَجَزَ وجبتْ عليه الهجرةُ من تلكَ الأرضِ. اهـ

"কুফরীর কারণে শাসক সর্বসম্মতিক্রমে অপসারিত হয়ে যাবে। তখন প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ হলো, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। যে তাতে সক্ষম হবে, তার জন্য রয়েছে প্রতিদান। যে শিথিলতা করবে, সে গুনাহগার হবে। আর যে অক্ষম, তার জন্য আবশ্য হলো ঐ ভূমি থেকে হিজরত করা।"– ফাতহুল বারি: ১৩/১৫৩

আর যদি দ্বিতীয় শর্তের ব্যত্যয় ঘটে তথা ইমাম শরীয়ত বহির্ভূত আদেশ দেন, তাহলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তো করা যাবে না, তবে তার উক্ত আদেশ বা নিষেধ মেনে চলা যাবে না। বরং যা শরীয়তের নির্দেশ তাই পালন করতে হবে।

***

আমাদের প্রেক্ষাপট

উপরোক্ত সারসংক্ষেপ কথা বুঝার পর এবার আমাদের প্রেক্ষাপটে আসি। আমরা জানি, বর্তমান তাগুত শাসকগোষ্ঠী মুরতাদ। আল্লাহর শরীয়ত প্রত্যাখান করে কুফরি শাসন প্রবর্তন, ইসলাম ও মুসলামানদের বিপক্ষে যুদ্ধে কাফেরদের পক্ষাবলম্বন, শরীয়তের বিধি বিধান নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল ইত্যাদি অসংখ্য কারণে এরা মুরতাদ হয়ে আছে। এমতাবস্থায় জিহাদের মাধ্যমে এদেরকে অপসারণ করে মুসলিম ভূমি এদের থেকে উদ্ধার করা ফরয। তাদের আদেশ-নিষেধ মেনে চলার তো কোন প্রশ্নই নেই।

শায়খের কথা মতো যদি এসব তাগুতকে মুসলমান এবং আমীরুল মু’মিনীন ধরেও নিই, তথাপি জিহাদের অনুমতি না দেয়া বা তাতে বাধা দেয়া সুস্পষ্ট শরীয়ত বহির্ভূত কাজ। এ ধরণের আদেশ-নিষেধে কোনো আনুগত্য নেই। আল্লাহ তাআলার আদেশ আমীরের আদেশের অগ্রবর্তী। জিহাদ আল্লাহ তাআলার নির্দেশ। আমীরের নিষেধের কারণে তা থেকে বিরত থাকা যাবে না। যারা আমীরের নিষেধের কারণে জিহাদ থেকে বিরত থাকবে, তাদেরকে ফরয তরকের গোনাহ মাথায় নিয়ে অপরাধী অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সামনে হাজির হতে হবে। এ বিষয়টি সামনে ইনশাআল্লাহ আমরা আরো একটু বিস্তারিত আলোচনা করবো।

***

আমীরের অনুমতি মাসলাহাতের সাথে সম্পৃক্ত

জিহাদ একটি নাজুক ইবাদত। এখানে সামান্য ভুল ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। এজন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নির্দেশনা ছাড়া এখানে কাজ করা শঙ্কামুক্ত নয়। সাধারণত জিহাদের ব্যাপারে ইমামুল মুসলিমীন ও তার উমারাগণ অভিজ্ঞ হয়ে থাকেন। আর তারা হবেন-ই বা না কেন, তাদেরকে তো এ কাজের জন্যই নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তারা তো সর্বক্ষণ এ কাজেই থাকেন। অধিকন্তু যে যার মতো জিহাদ করতে গেলে বিশৃংখলা দেখা দেবে। তাই শরীয়ত আমীর উমারাদের মেনে চলতে বলেছে। ইকদামি জিহাদের ক্ষেত্রেও এ কথা, দিফায়ী জিহাদের ক্ষেত্রেও এ কথা। ইকদামি জিহাদের বিষয়টা তো স্পষ্টই। আর দিফায়ির ক্ষেত্রেও বিষয়টা এমনই। কারণ, সব সময় এমন হয় না যে, শত্রু এসেই হঠাৎ সকলের অগোচরে হামলা করে বসে। বরং অনেক সময় আগে থেকেই জানা যায় যে, শত্রু আসছে। আবার অনেক সময় শত্রু এসে অবরোধ করে, আক্রমণ করে না। এসব ক্ষেত্রেও শরীয়ত যুদ্ধ শুরুর আগে ইমামের সাথে আলোচনা করে নিতে বলে। কারণ, সাধারণ মানুষ অনেক সময় শত্রুর অবস্থা, শক্তি, যুদ্ধের কলা-কৌশল ভাল জানে না। উমরাগণ এসব বিষয়

ভাল জানেন। তাই তাদের অনুমতি ও নির্দেশনা নিয়ে কাজ করা উচিৎ। হঠাৎ কিছু করতে গেলে বিপদের আশঙ্কা। তবে কোথাও যদি এমন হয় যে, শত্রু হামলা করে দিয়েছে এবং ইমামের নির্দেশনা নেয়ারও সুযোগ নেই, তখন ইমামের অনুমতি ছাড়াই হামলা প্রতিরোধ করবে। কারণ, ইমামের নির্দেশনা নিতে বলা হয়েছিল তো মূলত শত্রু প্রতিহত করার জন্যই। যখন ইমামের অনুমতির অপেক্ষায় থাকলে শত্রু প্রতিহত করা সম্ভব হচ্ছে না বা আরো কষ্টকর হচ্ছে, তখন আর অনুমতির দরকার নেই। এখানে নিজেরা জিহাদ শুরু করে দেয়ার মাঝেই মাসলাতাহ।

দলীল

সুন্নাহ থেকে এর প্রকৃষ্ট দুটি দলীল বিদ্যমান।

এক. গাযওয়ায়ে যু কারাদ

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একপাল উষ্ট্রী মাঠে চড়ছিল। কাফেররা হঠাৎ আক্রমণ করে সেগুলো চিনিয়ে নেয়। হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বাহিরে বের হয়েছিলেন। যখন তিনি দেখলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রীপাল চিনতাই হয়েছে, অনুমতির অপেক্ষা না করে এদের পেছনে ধাওয়া করেন এবং উটগুলো ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে খুশি হন।

যেহেতু অনুমতির অপেক্ষায় থাকলে উটগুলো উদ্ধার করা সম্ভবপর ছিল না, তাই অনুমতি ছাড়াই তিনি কিতালে জড়ান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ কাজে খুশি হন এবং তার প্রশংসা করেন এবং অধিক পরিমাণে গনিমত দেন। বুঝা গেল, এ ধরণের পরিস্থিতিতে অনুমতির প্রয়োজন নেই। হাদিসটি সহীহাইনে এসেছে। **মুসলিম শরীফে সালামা ইবনুল আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যবানিতে হাদিসটি নিম্নরূপ:**

خرجت قبل أن يؤذن بالأولى وكانت لقاح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترعى بذى قرد - قال - فلقينى غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال أخذت لقاح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلت من أخذها قال غطفان قال فصرخت ثلاث صرخات يا صباحاه. قال فأسمعت ما بين لابتى المدينة ثم اندفعت على وجهى حتى أدركتهم بذى قرد وقد أخذوا يسقون من الماء فجعلت أرميهم بنبلى وكنت راميا ... حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم ثلاثين بردة - قال - وجاء النبى -صلى الله عليه وسلم- والناس ... قال -

ثم رجعنا ويردفني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ناقته حتى دخلنا المدينة.

“ফজরের আযান হওয়ার আগেই আমি বের হলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধাল উষ্ট্রীগুলো যু কারাদে চড়ছিল। তখন আব্দুর রহমান ইবনু আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর এক গোলামের সাথে সাক্ষাৎ হল। সে বলল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রীপাল লুণ্টন হয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, কে নিয়েছে? উত্তর দিল, গাতফান গোত্রের লোকেরা। তিনি বলেন, তখন আমি (মদীনাবাসীকে সতর্ক করা এবং তাদের থেকে সাহায্য চাওয়ার উদ্দেশ্যে) তিনবার ‘ইয়া সাবাহা....’ বলে চিৎকার দিলামা। তিনি বলেন, সমগ্র মদীনায় আমার আওয়াজ পৌঁছাতে সক্ষম হলাম। এরপর দিলাম সামনের দিকে দৌঁড়। অবশেষে গিয়ে যু কারাদে তাদের নাগাল পেল। তারা তখন পানি উঠাচ্ছিল। আমি আমার তীর তাদের প্রতি নিক্ষেপ করতে লাগলাম। আর আমি ভাল তীরন্দাজ ছিলাম। ... এভাবে অবশেষে তাদের থেকে সকল উষ্ট্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হলাম এবং আরো ত্রিশটি চাদরও তাদের থেকে চিনিয়ে নিলাম। তিনি বলেন, এরপর রাসূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য লোক এসে উপস্থিত হল। ... তিনি বলেন, এরপর আমরা মদীনার দিকে ফিরলাম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তার উষ্ট্রীর পেছনে সওয়ার করালেন। এভাবে মদীনায় পৌঁছলাম।”- সহীহ মুসলিম ৪৭৭৮

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

فلما أصبحنا قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة ». قال ثم أعطانى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سهمين سهم الفارس وسهم الراجل

“(পরদিন) যখন সকাল হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাদের শ্রেষ্ঠ ঘোড়সওয়ার আবু কাতাদা আর শ্রেষ্ঠ পদাতিক সালামা। তিনি বলেন, এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে গনিমতে দুই ভাগ দিলেন: এক ভাগ অশ্বারোহীর, আরেক ভাগ পদারোহীর।”- সহীহ মুসলিম ৪৭৭৯

দুই. ইমাম মুরতাদ হয়ে গেলে

ইমাম যখন মুরতাদ হয়ে যাবে, তাকে অপসারণ করা ফরয। যারা কাফের ইমামের পক্ষ নেবে, তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করতে হবে। এটিই শরীয়তের নির্দেশ, যেমনটা হযরত উবাদা ইবনু সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস থেকে আমরা আলোচনা করে এসেছি। এখানে তো মুসলমানদের কোন ইমাম নেই। ইমাম তো মুরতাদ হয়ে গেছে। কিন্তু ইমাম নেই বলে শরীয়ত জিহাদ বন্ধ রাখতে বলেনি। সম্ভব হলে একজনকে ইমাম বানিয়ে নেবে। সম্ভব না হলে আপাতত একজনকে আমীর বানিয়ে নিয়ে মুরতাদের বিরুদ্ধে কিতাল করবে। মুরতাদ সরে গেলে নিজেরা একজনকে ইমাম বানিয়ে নেবে। তাতারদের বিরুদ্ধে সাইফুদ্দিন কুতজ এর জিহাদ এভাবেই হয়েছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান জিহাদও এভাবেই হয়েছে।

এবার ফুকাহায়ে কেরামের কয়েকটি বক্তব্য লক্ষ করুন-

ইবনে কুদামা রহ. (৬২০ হি.) বলেন,

وواجب على الناس إذا جاء العدو، أن ينفروا؛ المقل منهم، والمكثر، ولا يخرجوا إلى العدو إلا بإذن الأمير، إلا أن يفجأهم عدو غالب يخافون كلبه، فلا يمكنهم أن يستأذنوه. اهـ

“শত্রু এসে পড়লে ধনী-গরীব সকলের জন্য বের হয়ে পড়া ফরয। তবে ইমামের অনুমতি ছাড়া শত্রুর দিকে রওয়ানা দেবে না। তবে যদি এমন কোন শক্তিধর শত্রু হঠাৎ আক্রমণ করে বসে যার (সাথে কিতাল করতে দেরি করলে তার) থেকে সকলে অনিষ্টের আশঙ্কা করছে, যার ফলে ইমামের অনুমতি নেয়া সম্ভব হচ্ছে না- তাহলে কথা ভিন্ন।”- আলমুগনি ৯/২১৩

সামনে বলেন,

لا يخرجون إلا بإذن الأمير؛ لأن أمر الحرب موكول إليه، وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم، ومكامن العدو وكيدهم، فينبغي أن يرجع إلى رأيه، لأنه أحوط للمسلمين؛ إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لهم، فلا يجب استئذانه، لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليه، لتعين الفساد في تركهم، ولذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي - صلى الله عليه وسلم - فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجا من المدينة، تبعهم، فقاتلهم، من غير إذن، فمدحه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: خير رجالتنا سلمة بن الأكوع. وأعطاه سهم فارس وراجل. اهـ

“আমীরের অনুমতি ছাড়া বের হবে না। কারণ, যুদ্ধের দায়-দায়িত্ব তারই উপর ন্যাস্ত। শত্রুর সংখ্যা কম না বেশি এবং শত্রুর গোপন ঘাঁটি ও কৌশল-ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তিনিই ভাল অবগত। তাই তার মতামতই মেনে নেয়া চাই। এটাই মুসলামনদের জন্য অধিক কল্যাণ। তবে শত্রু যদি আকস্মিক আক্রমণ করে বসে, যার ফলে অনুমতি নেয়া সম্ভব না হয়, তাহলে তখন অনুমতি নেয়া আবশ্যক নয়। কেননা, তখন শত্রুর সাথে কিতাল করা এবং তার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার মাঝেই সনিশ্চিত কল্যাণ আর তাদেরকে ছেড়ে রাখার মাঝেই সুনিশ্চিত ক্ষতি। এ কারণেই কাফেররা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটপালের উপর আক্রমণ করেছিল এবং সালামা ইবনুল আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু মদীনার বাহিরে তাদের নাগাল পেলেন, তিনি অনুমতি ছাড়াই তাদের পেছনে ধাওয়া করলেন এবং কিতাল করলেন। এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রশংসা করে বলেছেন, ‘সালামা আমাদের পদাতিক বাহিনির শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা’ এবং তাকে একজন ঘোড়সওয়ার ও একজন পদাতিক যোদ্ধার সমপরিমাণ গনিমত দিয়েছেন।”- আলমুগনি ৯/২১৩-২১৪

এ আলোচনা ফরযে আইনের সময়কার। মাসলাহাতের খাতিরে এখানেও অনুমতির কথা বলেছেন। তদ্রূপ যখন অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে কিতাল শুরু করার মাঝেই মাসলাহাত তখন অনুমতি ছাড়াই জিহাদ শুরু করতে বলেছেন। বুঝা গেল, ইমাম বা আমীরের অনুমতি এমন কোন বিষয় নয় যা ব্যতীত জিহাদ সর্বাবস্থায় নাজায়েয। বরং বিষয়টি মাসলাহাতের সাথে সম্পৃক্ত।

খতিব শারবিনি রহ. (৯৭৭ হি.) বলেন,

لا تتسارع الطوائف والآحاد منا إلى دفع ملك منهم عظيم شوكته دخل أطراف بلادنا لما فيه من عظم الخطر. اهـ

“কাফেরদের প্রভূত শক্তিধর কোন সম্রাট আমাদের (দারুল ইসলাম) রাষ্ট্রের সীমান্তে প্রবেশ করে গেলে (আমীরের অনুমতি ও নির্দেশনা ছাড়া) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বা সাধারণ জনগণ তাকে প্রতিহত করতে তাড়াহুড়া করে কোন ব্যবস্থা নেবে না। কেননা, এতে ভীষণ বিপদের আশঙ্কা আছে।”- মুগনিল মুহতাজ ৬/২৪

এ আলোচনাও ফরযে আইনের বেলায়। কিন্তু বিপদের আশঙ্কা আছে বিধায় ইমামের অনুমতি ছাড়া জনগণ তড়িঘড়ি কোন ব্যবস্থা নিতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে আকস্মিক শত্রু আক্রমণ করে বসলে ভিন্ন কথা- যেমনটা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

ইবনে কুদামা রহ. (৬২০ হি.) বলেন,

فان عدم الامام لم يؤخر الجهاد لان مصلحته تفوت بتأخيره، وان حصلت غنيمة قسموها على موجب الشرع، قال القاضي وتؤخر قسمة الاماء حتى يقوم إمام احتياطا للفروج.اهـ

“যদি ইমাম না থাকে তাহলে এ কারণে জিহাদ পিছিয়ে দেয়া যাবে না। কেননা, পিছিয়ে দেয়ার দ্বারা জিহাদে নিহিত মাসলাহাত ও কল্যাণসমূহ হাতছাড়া হয়ে যাবে। গনীমত লাভ হলে হকদারদের মাঝে শরীয়তে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী বণ্টন করে নেবে। তবে কাজী রহ. বলেন, ইমাম নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত সতর্কতাবশত দাসীদের বণ্টন স্থগিত রাখবে।”- আলমুগনী ১০/৩৭৪

বুঝা গেল, জিহাদ ফরযে আইন হোক আর ফরযে কিফায়া হোক সকল অবস্থায় ইমাম বা আমীরের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। এর মাঝে মাসলাহাত। তবে যখন অনুমতি নিতে গেলে মাসলাহাত নষ্ট হবে, তখন অনুমতি ছাড়াই জিহাদ করবে। তদ্রূপ যদি ইমাম না থাকে, তথাপি বসে থাকা যাবে না। অবশ্য জিহাদ শুরু করার সময় তৎক্ষণাৎ একজনকে আমীর বানিয়ে নেবে। তদ্রূপ আমীর শহীদ হয়ে গেলেও একজনকে ততক্ষণাৎ আমীর বানিয়ে নেবে, যাতে শৃংখলা ঠিক থাকে; যেমনটা মূতার যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম করেছিলেন।

ইবনে কুদামা রহ. (৬২০ হি.) বলেন,

فإن بعث الإمام جيشا، وأمر عليهم أميرا، فقتل أو مات، فللجيش أن يؤمروا أحدهم، كما فعل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في جيش مؤتة، لما قتل أمراؤهم الذين أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أمروا عليهم خالد بن الوليد، فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - فرضي أمرهم، وصوب رأيهم، وسمى خالدا يومئذ: " سيف الله ". اهـ

“ইমাম যদি কাউকে আমীর নির্ধারণ করে তার নেতৃত্বে কোন বাহিনি পাঠান, অতঃপর উক্ত আমীর নিহত হয় বা মারা যায়,

তাহলে বাহিনি নিজেরা নিজেদের একজনকে আমীর বানিয়ে নিতে পারবে। যেমনটা মূতার যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম করেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতৃক নির্ধারিত আমীরগণ যখন সকলে শহীদ হয়ে যান, তখন তারা খালেদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিজেদের আমীর বানিয়ে নেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি তাদের এ কাজে সন্তুষ্ট এবং একে সঠিক বলেন। সেদিনই খালেদ রাদিয়াল্লাহুকে তিনি 'সাইফুল্লাহ'- 'আল্লাহর তরবারি' উপাধি দেন।"- আলমুগনি ৯/২০২-২০৩

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. (১৮৯ হি.) বলেন,

وإن نادى منادي الأمير بالنهي عن الخروج للعلافة فلا ينبغي لأهل منعة ولا لغيرهم أن يخرجوا. إلا أنه ينبغي للإمام أن يبعث لذلك قوماً وينبغي أن يؤمر عليهم أميراً لتتفق كلمتهم ويتمكنوا من المحاربة مع المشركين إن ابتلوا بذلك وكذلك إن خرجوا مفريقين قبل نهي الإمام فهجم عليهم العدو فينبغي لهم أن يجتمعوا ويؤمروا عليهم أميراً ثم يقاتلوا. اهـ

"(যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার পর) আমীরের ঘোষক যদি ঘোষণা দেয় যে, দানা পানির জন্য বাহিরে যাওয়া নিষেধ- তাহলে সংঘবদ্ধ হোক বা না হোক- কারো জন্যই বাহিরে যাওয়া উচিৎ

হবে না। তবে ইমামের উচিৎ দানা পানির জন্য কিছু লোককে পাঠানো এবং পাঠানোর সময় একজনকে আমীর বানিয়ে দেয়া। যাতে তারা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারে এবং মুশরিকদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হলে যেন যুদ্ধ করতে সমর্থ্য হয়।

তদ্রূপ ইমাম নিষেধ করার পূর্বেই যদি (আমীর ছাড়া) বিক্ষিপ্তভাবে বেরিয়ে পড়ে অতঃপর তাদের উপর শত্রুরা আকস্মিক আক্রমণ করে বসে, তাহলে তাদের উচিৎ ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়া তারপর যুদ্ধ শুরু করা।”- শরহুস সিয়ারিল কাবির ১/৯৪

সারমর্ম

উপরোক্ত আলোচনার সারমর্ম, জিহাদের জন্য একজন আমীর এবং তার নির্দেশনা আবশ্যক। আমীরের অনুমতি ব্যতীত নিজেরা কিছু করতে যাবে না। তবে বিষয়টি মাসলাহাতের সাথে সম্পৃক্ত। যেখানে আমীরের অনুমতি নিতে গেলে মাসলাহাত ছুটে যাবে, সেখানে আমীরের অনুমতি নিতে হবে

না। আমীরের অনুমতি ছাড়াই জিহাদ করবে। তবে উপস্থিত সময়ে ঐক্য ঠিক রাখার জন্য আমীর না থাকলে একজনকে আমীর বানিয়ে নেবে। তদ্রূপ আগের আমীর শহীদ হয়ে গেলে বা মারা গেলেও নিজেদের একজনকে আমীর বানিয়ে নেবে তারপর কিতাল শুরু করবে। আমীর না বানিয়ে কিতাল শুরু করা উচিৎ নয়।

***

যখন প্রমাণ হল, আমীরের সম্পর্ক মাসলাহাতের সাথে তখন আমাদের সামনে নিম্নের সূরতগুলো আপনা আপনি সমাধান হয়ে যাবে:

♣ ইমাম ফরযে আইন জিহাদে বাধা দিলে

ইমাম মুহাম্মদ রহ. 'আসসিয়ারুল কাবীর' এ বলেন,

وإن نهى الإمام الناس عن الغزو والخروج للقتال فليس ينبغي لهم أن يعصوه إلا أن يكون النفير عاما. اهـ

"ইমাম যদি লোকজনকে যুদ্ধ করতে এবং কিতালে বের হতে নিষেধ করে, তাহলে তাদের জন্য তার আদেশ অমান্য করা জায়েয হবে না। তবে যদি নাফীরে আম হয়ে যায় তাহলে ভিন্ন কথা।" -শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ২/৩৭৮

অর্থাৎ নাফিরে আম হয়ে গেলে তথা কাফেররা মুসলিম ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালালে ইমাম নিষেধ করলেও জিহাদে যেতে হবে। কাফেররা আক্রমণ করার কারণে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেছে। ইমাম যদি এ জিহাদে বের হতে নিষেধ করেন, তাহলে তিনি আল্লাহর আদেশের পরিপন্থী আদেশ দিলেন যা মান্য করা যাবে না। যেমনটা আমরা আগে আলোচনা করে এসেছি। আরেকটি হাদিসে কথাটি এভাবে এসেছে,

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

“খালেকের নাফরমানী করে মাখলূকের আনুগত্য বৈধ নয়।”- মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: ৩৪৪০৬

মালিকী মাযহাবের কিতাব ‘ফাতহুল আলিয়্যিল মালিক’ এ বলা হয়েছে:

قال ابن حبيب سمعت أهل العلم يقولون إن نهى الإمام عن القتال لمصلحة حرمت مخالفته إلا أن يزحمهم العدو وقال ابن رشد طاعة الإمام لازمة , وإن كان غير عدل ما لم يأمر بمعصية ومن المعصية النهي عن الجهاد المتعين.اهـ

“ইবনে হাবীব রহ. বলেন, আমি আহলে ইলমদেরকে বলতে শুনেছি, ইমাম কোন মাসলাহাতের প্রতি লক্ষ্য করে কিতাল করতে নিষেধ করলে তার বিরুদ্ধাচরণ করা হারাম। তবে যদি শত্রু আক্রমণ করে বসে তাহলে ভিন্ন কথা। ইবনে রুশদ রহ.বলেন, ইমাম ন্যায় পরায়ণ না হলেও তার আনুগত্য আবশ্যক, যতক্ষণ না কোন গুনাহের আদেশ দেন। আর ফরযে আইন জিহাদে বাধা দেয়া গুনাহের কাজ।”- ফাতহুল আলিয়্যিল মালিক: ৩/৩

আল্লামা ইবনে হাযম রহ. বলেন-

و لا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهي عن جهاد الكفار و أمر بإسلام حريم المسلمين إليهم ...اهـ

"কুফরের পর কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা থেকে বাধা দেয়া এবং মুসলমানদের ভূমিকে তাদের হাতে সমর্পণ করতে আদেশ করার চেয়ে বড় কোন গুনাহ নেই।" -আল-মুহাল্লা: ৭/৩০০

অতএব, ইমাম জিহাদে বাধা দিলে তার নিষেধাজ্ঞা মান্য করা যাবে না। শত্রু আক্রমণ করে বসলে আল্লাহ তাআলার আদেশ হল তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা। আল্লাহ তাআলার আদেশের সামনে ইমামের নিষেধের কোন মূল্য নেই।

♣ ইমাম জিহাদ না করলে বা জিহাদের অনুমতি না দিলে

ইবনু আসাকির রহ. (৫৭১হি.) আহমাদ ইবনু সা’লাবা আলআমিলি রহ. থেকে বর্ণনা করেন,

سئل وكيع بن الجراح عن قتال العدو مع الإمام الجائر قال: إن كان جائرا وهو يعمل في الغزو بما يحق عليه فقاتل معه. وإن كان يرتشي منهم ويهادنهم فقاتل على حيالك. اهـ

“জালেম ইমামের সাথে মিলে শত্রুর (তথা কাফেরদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে ওয়াকি’ ইবনুল জাররাহ রহ. (১৯৭হি.) এর কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি উত্তর দেন, জালেম হলেও যদি যথাযথভাবে জিহাদ করে, তাহলে তার সাথে মিলেই যুদ্ধ কর। পক্ষান্তরে যদি শত্রুদের থেকে ঘুষ নেয় এবং তাদের সাথে স্বজনপ্রীতির আচরণ করে, তাহলে তুমি তোমার নিজের মতো করে (আলাদা) জিহাদ করো।”- তারিখে দিমাশক ৭১/৪৭

লক্ষ্যণীয়, ইমাম বিদ্যমান থাকাকালেও যদি ইমাম খিয়ানত করে, অর্থের লোভে জিহাদ বন্ধ করে দেয় বা শত্রুদের সাথে স্বজনপ্রীতি দেখায়, তাহলে ইমামের অনুমতি ছাড়াই আলাদা জিহাদ করার কথা বলেছেন। এ কথা বলেননি যে, ইমাম

জিহাদ বন্ধ করে রাখলে, তিনি অনুমতি না দিলে নিজে থেকে জিহাদ করতে যেও না; নিজে থেকে করতে গেলে হারাম হবে- এসব কিছুই বলেননি। বরং জিহাদ করতে বলেছেন। এবার আমাদের সরকারগুলোর অবস্থা বিবেচনা করুন।

খতীব শারবিনী শাফিয়ি রহ. (৯৭৭ হি.) বলেন,

[فصل] فيما يكره من الغزو ، ومن يحرم أو يكره قتله من الكفار ، وما يجوز قتالهم به (يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه) تأدبا معه ، ولأنه أعرف من غيره بمصالح الجهاد ، وإنما لم يحرم ؛ لأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفوس وهو جائز في الجهاد...

. تنبيه : استثنى البلقيني من الكراهة صورا

. إحداها : أن يفوته المقصود بذهابه للاستئذان

ثانيها : إذا عطل الإمام الغزو وأقبل هو وجنوده على أمور الدنيا كما يشاهد .

ثالثها : إذا غلب على ظنه أنه لو استأذنه لم يأذن له . اهـ

“ইমাম বা তার নায়েবের অনুমতি ছাড়া জিহাদ মাকরুহ। ... তবে বুলকিনি রহ. কয়েক সূরতকে এর ব্যতিক্রম বলেছেন। ১. অনুমতি নিতে গেলে যদি জিহাদের মূল উদ্দেশ্য হাতছাড়া

হয়ে যায়।

২. যদি ইমাম ও তার সৈন্য-সামন্ত জিহাদ ছেড়ে দুনিয়ার ভোগ বিলাসিতায় লিপ্ত হয়ে যায়।

৩. যদি প্রবল ধারণা হয় যে, অনুমতি চাইলে অনুমতি দেবে না।" – মুগনিল মুহতাজ: ১৭/২৮৭

অর্থাৎ যদি শত্রু আক্রমণ করে বসে আর ইমামের অনুমতি নিতে গেলে শত্রুর পক্ষ থেকে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তাহলে অনুমতি ছাড়াই জিহাদ করবে। কেননা, এখানে অনুমতি নিতে গেলে জিহাদের উদ্দেশ্য- তথা শত্রু প্রতিহত করা- ব্যহত হবে। তদ্রূপ ইমাম যদি জিহাদ ছেড়ে বসে থাকে বা কোন ওজর ছাড়াই কাউকে জিহাদে যেতে নিষেধ করবে মনে হয়ে থাকে, তাহলে ইমামের অনুমতি ছাড়া নিজেরাই জিহাদ করে নেবে। শারবিনী রহ. এর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, জিহাদ আল্লাহ তাআলার বিধান। ইমাম শুধু শৃংখলার জন্য। যখন ইমামের অনুমতি নিতে গেলে যখন এ ফরযে ব্যাঘাত ঘটার আশঙ্কা থাকবে, তখন অনুমতি নেবে না। তদ্রূপ, ইমাম এ ফরয আদায়ে গাফলতি করলে নিজেদের দায়িত্ব নিজেদেরকেই আদায় করতে হবে।

***

♣ কাশ্মীর জিহাদ ও রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতি

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে বুঝলাম: ইমাম না থাকলেও জিহাদ ছাড়া যাবে না; তদ্রূপ ইমাম জিহাদ না করলে, অনুমতি না দিলে বা বাধা দিলে ইমামের অনুমতি ব্যতিরেকেই জিহাদ করে নিতে হবে। অর্থাৎ আমরা জিহাদের দায়িত্বটা ইমামের হাতে তখনই ন্যাস্ত করবো, যখন ইমাম নিয়মিত জিহাদ করবেন। এর ব্যতিক্রম হলে নিজেদের দায়িত্ব নিজেদেরকেই আদায় করতে হবে।

এবার আমাদের বাংলাদেশসহ অন্য সকল তাগুতি রাষ্ট্রের দিকে তাকাই। আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী এরা মুরতাদ। স্বয়ং এদের বিরুদ্ধেই জিহাদ ফরয। আর তাদের আনুগত্যের তো কোন প্রশ্নই আসে না। যেমনটা আল্লাহ তাআলা আদেশ দিয়েছেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً

“হে নবী, আপনি আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফের মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজান্তা

ও মহাপ্রজ্ঞাময়।” – সূরা আহযাব: ১

কাজেই তাদের আদেশ নিষেধের কোন মূল্য নেই।

আর আবু বকর যাকারিয়া সাহেবের মতো যারা এদেরকে মুসলমান এবং আমীরুল মুমিনীন মনে করেন, তাদের ধারণা অনুযায়ীও কাশ্মীর বা অন্য কোন ভূখণ্ডে জিহাদে যেতে এদের অনুমতি লাগবে না। তারা যখন জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে, অন্যদেরকেও করতে দিচ্ছে না, বরং তারা নিজেরাই কাফেরদের বাহিনিতে পরিণত হয়েছে, তখন এদের আদেশ নিষেধের কোন মূল্য নেই। কাজেই বর্তমান তাগুতি রাষ্ট্রগুলোতে বসবাসরত যেকোন মুসলমান – নিরাপত্তা ও মাসলাহাতের দিকটি বিবেচনায় রেখে- পৃথিবীর যেকোন রাষ্ট্রে গিয়ে জিহাদে শরীক হতে পারবে। শরয়ী *দৃষ্টিকোণ থেকে কোনই বাধা নেই; বরং এটাই দায়িত্ব। অবশ্য আগেও বলেছি,

- যার-তার কথায় চলে যাবে না। মুজাহিদদের সাথে নিরাপদ

ও পাকাপোক্ত যোগাযোগ হওয়ার পরই কেবল যাবে।

- তদ্রূপ এ কথাও বলেছি, নিজ দেশের তাগুতদের বিরুদ্ধে জিহাদের দাঁড়ানোর প্রচেষ্টা করাই নিয়ম। বিশেষ দরকার পড়লেই কেবল অন্য ভূমিতে হিজরত করবে, অন্যথায় নয়। সারা দুনিয়াই এখন জিহাদের ময়দান। সুবিধামতো সব জায়গাতেই জিহাদের ঝাণ্ডা বুলন্দ করতে হবে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

***

জিহাদে কাশ্মীর এবং বালআম বিন বাউরার উত্তরসূরিদের বিভ্রান্তির অপপ্রয়াস- ০4

সংশয়: দুর্বলতা এবং শত্রু সৈন্যের আধিক্যতা

শায়খের কথা থেকে বুঝা যাচ্ছে, ভারতের মোকাবেলা করার

মতো শক্তি কাশ্মিরিদের নেই। ভারতের সৈন্য সংখ্যা মুসলমানদের দ্বিগুণের চেয়েও বেশি। এমতাবস্থায় জিহাদ করতে যাওয়া 'ইলকাউন নাফস ইলাততাহলুকা' তথা আত্মহত্যা হবে। কাজেই কাশ্মিরিদের জন্য জিহাদে দাঁড়ানো হারাম।

পর্যালোচনা

প্রথমত

কাশ্মিরে অন্তত ২০/২৫ লাখের মতো যুদ্ধোপোযোগি যুবক আছে। তারা অন্তত তাদের দ্বিগুণ তথা ৪০/৫০ লাখ মুশরিকের মোকাবেলা করতে সক্ষম। আর যদি ভারতের মুসলমানদের ধরা হয়, তাহলে সমগ্র ভারতে অন্তত ৩/৪ কোটি যুদ্ধোপোযোগি যুবক আছে। এরা অন্তত ৬-৮ কোটি মুশরিকের মোকাবেলা করতে সক্ষম। তাহলে মুসলমানরা দুর্বল কোথায়? আমাদের দুর্বলতা ফ্রিজে পানি বরফ করে রেখে ঠাণ্ডার অজুহাতে তায়াম্মুম করার মতো।

দ্বিতীয়ত

শত্রু সংখ্যা দ্বিগুণ হলে জিহাদ হারাম বলে কোন কথা শরীয়তে নেই। এটি সম্পূর্ণই বানোয়াট। ইয়াহুদিদের মানস সন্তান দরবারি আলেমরাই কেবল এ কথা বলে বেড়ায়। নতুবা কুরআন, হাদিস বা আইম্মায়ে কেরামের কারো বক্তব্যে আপনি এ ধরণের কথা পাবেন না। আল্লাহ তাআলা শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর উপর রহম করুন, তিনি এসব নিফাকপ্রসূত সংশয়ের অপনোদন করে উম্মাহর সঠিক রাহনুমায়ি করে গেছেন সাতশো বছর আগেই। এ ব্যাপারে قاعدة في الإنغماس في العدو তথা ‘শত্রুবাহিনির ব্যূহের ভেতরে ঢুকে আক্রমণ’ নামক তার একটি স্বতন্ত্র রিসালা রয়েছে। ইনশাআল্লাহ সেখান থেকে চয়নকৃত কিছু বক্তব্য পেশ করবো। বিস্তারিত ঐ রিসালাতে দেখা যেতে পারে।

♣ শত্রুবাহিনি দ্বিগুণের বেশি হলে

এ ব্যাপারে প্রথমে আমরা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ কুরআনে কারীমের আয়াতগুলো দেখি। আল্লাহা তাআলা ইরশাদ করেন,

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (64) يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا

مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (65)

"৬৪. হে নবী! আপনার এবং আপনার অনুসারি মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট (কাজেই জনবল ও সরঞ্জামাদির স্বল্পতায় আপনি ঘাবড়াবেন না)।
৬৫. হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে যুদ্ধের প্রতি উৎসাহিত করুন। তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন দৃঢ়পদ-অবিচল ব্যক্তি থাকে, তাহলে (ওদের) দু'শো জনের উপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের একশো থাকলে তারা কাফেরদের হাজার জনের উপর বিজয়ী হবে, কারণ তারা (কাফেররা) এমন সম্প্রদায় যারা (জিহাদের ফজিলত) বুঝে না। (তারা যুদ্ধ করে দুনিয়ার জন্য, আর তোমরা দ্বীনের জন্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মহা প্রতিদান লাভের উদ্দেশ্যে। কাজেই তারা তোমাদের সামনে দৃঢ়পদ থাকতে পারবে না।)।"- আনফাল ৬৪-৬৫

ইসলামের শুরু যামানায় একজন মুমিন দশজন কাফেরের মোকাবেলা করা ফরয ছিল। আল্লাহ তাআলা সুসংবাদ দিয়েছেন, তোমাদের যদি একজন দশজনের মোকাবেলাও করতে হয় তথাপি তোমরাই বিজয়ী হবে। শর্ত হল, সবরের

সাথে মোকাবেলা করতে হবে। কিন্তু পরবর্তীতে যখন মুহাজির ও আনসারদের বাহিরের লোকজনও মুসলমান হতে থাকলো, যাদের ঈমানী মজবুতি ও সবর তাদের সমান ছিল না, তাই তাদের পক্ষে একজন দশজনের মোকাবেলা কঠিন ছিল। এ দিকটি বিবেচনা করে আল্লাহ তাআলা দায়িত্ব হালকা করে দিয়েছেন। বিধান দিয়েছেন, একজন দু'জনের মোকাবেলা করতে হবে। দ্বিগুণের বেশি হলে মোকাবেলা ফরয নয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (66)

"আল্লাহ এখন ভার লাঘব করে দিয়েছেন এবং তিনি জেনেছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে। অতএব, তোমাদের যদি একশো দৃঢ়পদ-অবিচল ব্যক্তি থাকে, তাহলে দু'শো জনের উপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের এক হাজার থাকলে আল্লাহর হুকুমে দু' হাজারের উপর বিজয়ী হবে। আর আল্লাহ সবরকারী-দৃঢ়পদ লোকদের সাথে আছেন। (সংখ্যায়-সরঞ্জামে স্বল্প হলেও আল্লাহ তাদের নুসরত করবেন)।"- আনফাল ৬৬

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়:

এক.

শত্রু সংখ্যা দ্বিগুণ হলে মোকাবেলা ফরয নয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, মোকাবেলা জায়েয নয়। বরং শরীয়তের অন্যান্য দলীল দ্বারা স্পষ্ট যে, শত্রু সংখ্যা অনেক গুণ বেশি হলেও, মৃত্যু নিশ্চিত হলেও ময়দান ত্যাগ না করে লড়াই করে যাওয়া এমনকি শহীদ হয়ে যাওয়া আল্লাহ তাআলার পছন্দ। এ ব্যাপারে আমরা সামনে ইনশাআল্লাহ দলীলভিত্তিক আলোচনা করবো। ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

هذا أكثر ما فيه أنه لا تجب المصابرة لما زاد على الضعف ليس في الآية أن ذلك لا يستحب ولا يجوز. اهـ

“এখানে বেশির চেয়ে বেশি এ কথা বলা যায় যে, দ্বিগুণের বেশি হলে মোকাবেলা ফরয নয়। আয়াতে এ কথা নেই যে, মোকাবেলা মুস্তাহাব নয় বা জায়েয নয়।”- কায়িদাতুন ফিলইনগিমাসি ফিলআদুউ ৫৭

দুই.

প্রথমে একজন দশজনের মোকাবেলা ফরয ছিল। পরে আল্লাহ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহে দায়িত্ব হালকা করে দিয়েছেন। বুঝা গেল, একজন মুমিন হিম্মত করলে দশজনের মোকাবেলা করতে সক্ষম। এক হাজার দশ হাজরের, এক লাখ দশ লাখের মোকাবেলা করতে সক্ষম। যদি তারা সবরের সাথে মোবাবেলা করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তারা বিজয়ী হবে। জাসসাস রহ. (৩৭০হি.) বলেন,

قوله تعالى {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا} لم يرد به ضعف القوى والأبدان وإنما المراد ضعف النية لمحاربة المشركين فجعل فرض الجميع فرض ضعفائهم. اهـ

“আল্লাহ তাআলার বাণী- ‘আল্লাহ এখন ভার লাঘব করে দিয়েছেন এবং তিনি জেনেছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে’: এখানে সাজ-সরঞ্জাম ও শারিরীক শক্তির দুর্বলতা উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হল, মুশরিকদের বিরুদ্ধে কিতালের নিয়্যত ও হিম্মতের দুর্বলতা। দুর্বল হিম্মতের লোকদের ফরয যতটুকু (তথা দু’জনের মোকাবেলা করা), (উচ্চ হিম্মতের লোকসহ) সকলের বেলায় সেটুকুই ফরয করা হয়েছে।”- আহকামুল কুরআন ৩/৯২

অর্থাৎ ফরয তো সকলের জন্য একই, কিন্তু হিম্মত করলে একজন দশজনের মোকাবেলা করতে পারবে। যেমনটা আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলেন,

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

“কত ছোট ছোট দল রয়েছে যারা আল্লাহর হুকুমে বড় বড় বাহিনির উপর বিজয়ী হয়েছে!! আল্লাহ সবর ও অবিচলতার পরিচয়দাতাদের সাথে আছেন।”- বাকারা ২৪৯

তিন.

দ্বিগুণের বেশি হলে মোকাবেলা ফরয নয়- এ বিধান ইকদামি জিহাদে। পক্ষান্তরে দিফায়ি জিহাদ তথা যেখানে মুসলমানরা নিজেরাই আগ্রাসনের শিকার, সেখানে বিধান ভিন্ন। সেখানে শত্রু সংখ্যা যতই বেশি হোক মোকাবেলা করতে হবে। একান্তই যদি কেউ মোকাবেলায় অক্ষম হয়ে পড়ে তার কথা ভিন্ন। ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

فإذا كان المؤمنون طالبين لم تجب عليهم أن يصابروا أكثر من ضعفيهم، وأما إذا كانوا هم المطلوبين وقتالهم قتال وقع عن أنفسهم فقد تجب المصابرة كما وجبت عليهم المصابرة يوم أحد ويوم الخندق مع أن العدو كانوا أضعافهم.

وذم الله المنهزمين يوم أحد والمعرضين عن الجهاد يوم الخندق في سورة آل عمران والأحزاب؛ بما هو ظاهر معروف. اهـ

"যখন মুমিনরা (কাফেরদের ভূমি বিজয়ের জন্য) কাফেরদের উপর আক্রমণ করতে যাবে, তখন দ্বিগুণের বেশির মোকাবেলা ফরয নয়। পক্ষান্তরে যখন মুমিনরা নিজেরাই আগ্রাসনের শিকার হবে এবং তাদের কিতাল হবে আত্মরক্ষার্থে, তখন মোকাবেলা ফরয। যেমন, উহুদ ও খন্দকের দিন মোকাবেলা ফরয ছিল- অথচ শত্রুবাহিনি অনেক গুণ বেশি ছিল। উহুদের দিন যারা ময়দান ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল এবং খন্দকের দিন যারা জিহাদবিমুখতা প্রদর্শন করেছিল, আল্লাহ তাআলা সূরা আলে ইমরান ও আহযাবে তাদের যে কত কুৎসা বর্ণনা করেছেন তা (সকলের) কাছে সুস্পষ্ট ও জানাশুনা।"- কায়িদাতুন ফিলইনগিমাসি ফিলআদুউ ৫৭

[বি.দ্র. কিতাবে ظالمين ও المظلومين লেখা আছে। তবে আলোচনার আগ-পর থেকে স্পষ্ট যে, طالبين ও المطلوبين হবে।]

উহুদে সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন সাতশো আর কাফেররা ছিল

তিন হাজার, তদ্রূপ খন্দকে সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন তিন হাজার আর কাফেররা ছিল দশ হাজার- যা তাদের তিনগুণেরও বেশি। তখন মোকাবেলা ফরয ছিল। উহুদে মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই তার তিনশো সাথীসহ চলে আসে। খন্দকে মুনাফিকরা বিভিন্ন বাহানা তুলে জিহাদ থেকে সরে পড়তে চেয়েছিল। কুরআনে কারীমে তাদের সকলের নিফাক তুলে ধরে সমালোচনা করা হয়েছে। বুঝা গেল, দিফায়ি জিহাদে সংখ্যার হিসাব নেই। সামর্থ্যানুযায়ী দিফা করতে হবে। যেমনটা ইবনে তাইমিয়া রহ. অন্যত্র বলেছেন,

وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم. اهـ

“প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ মুসলমানদের দ্বীন ও সম্মানের উপর আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করার সবচেয়ে গুরুতপূর্ণ স্তর, যা সর্বসম্মতিক্রমে ফরয। যে আগ্রাসী শক্তি মুসলমানদের দ্বীন-দুনিয়া উভয়টিকে ধ্বংস করে, ঈমান আনার পর তাকে প্রতিরোধের চেয়ে কোনো গুরুতর ফরয নেই। এই ক্ষেত্রে কোনো শর্ত প্রযোজ্য নয়, বরং সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিরোধ করতে হবে। আমাদের ফুকাহাগণ ও অন্যান্য ফুকাহায়ে কেরাম

সুস্পষ্টভাবে তা বর্ণনা করেছেন।”- আলফাতাওয়াল কুবরা ৪/৬০৮

অন্যত্র বলেন,

فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين، فإنه يصير دفعه واجبًا على المقصودين كلهم، وعلى غير المقصودين؛ لإعانتهم، كما قال الله تعالى : {وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعليكم النَّصْرُ إِلاَّ على قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ} [الأنفال : 72]، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن. وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله، مع القلة والكثرة، والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد، كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو، الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج. بل ذم الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم: {يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا} [الأحزاب: 13]. اهـ

“শত্রু যখন মুসলমানদের উপর আক্রমণ করার ইচ্ছা করে, তখন যাদের উপর আক্রমণ করতে চায়, তাদের সকলের উপর ফরজ হয়ে যায় তাদেরকে প্রতিহত করা। যাদের উপর আক্রমণ করেনি, তাদের উপরও আক্রান্তদের সাহায্যে শত্রুর মোকাবেলা করা ফরজ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ

করেন, ‘আর যদি তারা দ্বীনের জন্য তোমাদের সাহায্য চায়, তাহলে তোমাদের কর্তব্য তাদের সাহায্য করা। তবে তা যেন এমন ক্বওমের বিরুদ্ধে না হয়, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে।’ যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানের সাহায্য করার আদেশ দিয়েছেন। (যার কাছে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে) সে ব্যক্তি চাই যুদ্ধের জন্য বেতনভুক্ত হোক বা না হোক (উভয় অবস্থায়ই তার উপর আবশ্যক সাহায্য করা)। প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী জান এবং মাল দিয়ে সাহায্য করা ফরজ। কম-বেশি, পায়দল কিংবা সওয়ার হয়ে-যেভাবে সম্ভব। যেমন, খন্দকের বছর (আহযাব যুদ্ধে) যখন শত্রুরা মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালায়, তখন আল্লাহ তায়ালা কাউকেই জিহাদ থেকে বিরত থাকার অনুমতি দেননি; যেমন অনুমতি দিয়েছিলেন আক্রমণাত্মক জিহাদের বেলায়, যেখানে আগে বেড়ে কাফেরদের উপর হামলা করা হয়। সেখানে মুসলমানদেরকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। অংশগ্রহণকারী ও তরককারী। কিন্তু এখানে যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিহাদ ত্যাগ করার অনুমতি চেয়েছিল, তাদের তিরস্কার করে বলেছেন, ‘তাদের একদল এই বলে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি চাইল যে, আমাদের বাড়ি-ঘরগুলো অরক্ষিত। অথচ বাস্তবে সেগুলো

অরক্ষিত ছিল না; বরং তাদের অভিপ্রায় ছিল (কোনো উপায়ে) পালিয়ে যাওয়া'।"- মাজমুউল ফাতাওয়া ২৮/৩৫৮

ইবনুল কায়্যিম রহ. (৭৫১হি.) বলেন,

فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبا ولهذا يتعين على كل أحد. يجاهد فيه العبد بإذن سيده وبدون إذنه والولد بدون إذن أبويه والغريم بغير إذن غريمه وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين فكان الجهاد واجبا عليهم لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيار. اهـ

"দিফায়ি জিহাদ ইকদামি জিহাদের তুলনায় বিস্তৃত ও ব্যাপকভাবে ফরজ হয়। এ কারণেই তা প্রত্যেকের উপর ফরজে আইন। গোলাম তাতে মনিবের অনুমতি নিয়ে, না নিয়ে উভয় অবস্থায়ই জিহাদ করবে। সন্তান পিতা-মাতার এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণদাতার অনুমতি ছাড়াই জিহাদ করবে। *এই প্রকার জিহাদের দৃষ্টান্ত উহুদ ও খন্দকের জিহাদ। এই প্রকার জিহাদে শত্রুসংখ্যা মুসলমানদের দ্বিগুণ বা তার কম হওয়া শর্ত নয়। কারণ, উহুদ ও খন্দকে কাফেরদের সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে অনেকগুণ বেশি ছিল। এরপরও জিহাদ ফরজ ছিল।*

কারণ, এ জিহাদ করতে হয় জরুরি ভিত্তিতে এবং আক্রমণকারী শত্রুর প্রতিরোধে। এটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত (তথা ইকদামি) জিহাদ নয়।”- আলফুরূসিয়্যাতুল মুহাম্মাদিয়া ১৮৮

জিহাদে কাশ্মীর এবং বালআম বিন বাউরার উত্তরসূরিদের বিভ্রান্তির অপপ্রয়াস- ০৫

নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও মোকাবেলা করা জায়েয বরং প্রশংসনীয়

পূর্বোক্ত আলেচনা থেকে স্পষ্ট, শত্রু সংখ্যা যতই হোক, মোকাবেলা করা কাশ্মিরিদের জন্য ফরয। দ্বিগুণ বা তার কম হওয়ার শর্ত প্রযোজ্য নয়। এ আলোচনা থেকে আশাকরি শায়খ আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়ার মূর্খতাও স্পষ্ট। শরীয়তের এমন সুস্পষ্ট বিষয় এবং যার ব্যাপারে স্বয়ং ইবনে তাইমিয়া রহ. এর স্পষ্ট নসও বিদ্যমান (যে ইবনে তাইমিয়াকে আশ্রয় করে তারা নিজেদেরকে সালাফি দাবি

করে)- এমন স্পষ্ট বিষয়কে যারা অস্বীকার করে, অপব্যাখ্যা করে: তারা কিসের সালাফি? সালাফিয়্যাত আর হাদিস হাদিস করে এরা উম্মাহকে ধোঁকায় ফেলতে চায়। তাগুতের নেক দৃষ্টি লাভের জন্য তারা সব কিছুই করে। এদের সাথে ইবনে তাইমিয়ার কি সম্পর্ক, আর সালাফিয়্যাতেরই বা কি সম্পর্ক? এগুলো সব ধোঁকা। শুধু আল্লাহ আরশে সমাসীন কি'না, তাবিজ ব্যবহার বৈধ কি'না- এসব মাসআলার জিগির তোলে সালাফিয়্যাতের রং লাগাতে চায়। যখন কুফর বিততাগুতের কথা আসে, কিতাল ফি সাবিলিল্লাহর কথা আসে- তখন মুনাফিকদের মতো এদের চোখ ছানা বড় হয়ে যায়, যেন মৃত্যুর মূর্চা শুরু হয়ে গেছে। এরা আর যাই হোক- ইবনে তাইমিয়ার সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই। সালাফিয়্যাত থেকেও এরা হাজারো লাখো ক্রোশ দূরে।

যাহোক, শায়খ মূর্খতা বা স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে কুরআনে কারীমের আয়াতগুলোর অপব্যাখ্যা করে শত্রু সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি হলে জিহাদ নিষেধ করে দিয়েছেন। আমরা আলহামদুলিল্লাহ দেখিয়েছি, কুরআন সুন্নাহর আলোকে এ

কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা আর ধোঁকা। শত্রু সংখ্যা বেশি এবং মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও মোকাবেলা করা শুধু জায়েযই নয় বরং প্রশংসনীয়। **শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর কয়েকটি সূরত তুলে ধরে বলেন,**

" الرجل أو الطائفة يقاتل منهم أكثر من ضعفيهم إذا كان في قتالهم منفعة للدين، وقد غلب على ظنهم أنهم يقتلون"

كالرجل: يحمل وحده على صف الكفار ويدخل فيهم. ويسمي العلماء ذلك: "الانغماس في العدو"؛ فإنه يغيب فيهم كالشيء ينغمس فيه فيما يغمره.

وكذلك الرجل: يقتل بعض رؤساء الكفار بين أصحابه. مثل أن يثب عليه جهرة إذا اختلسه، ويرى أنه يقتله ويغتفل بعد ذلك

والرجل: ينهزم أصحابه فيقاتل وحده أو هو وطائفة معه العدو وفي ذلك نكاية في العدو، ولكن يظنون أنهم يقتلون
فهذا كله جائز عند عامة علماء الإسلام من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم. وليس في ذلك إلا خلافا شاذا. وأما الأئمة وغيرهما فقد نصوا على "المتبعون كـ: "الشافعي" و"أحمد وغيرهما. "جوز ذلك. وكذلك: هو مذهب: "أبي حنيفة، و"مالك ودليل ذلك: الكتاب، والسنة، وإجماع سلف الأمة. اهـ

“মাসআলা: কোনো একক ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র একটি দল তাদের দ্বিগুণের চেয়েও বেশি শত্রুর মোকাবেলা করা- যখন তাদের কিতালে দ্বীনের কোনো উপকার সাধিত হয়, তবে তাদের প্রবল ধারণা যে, তারা সকলে নিহত হবে;

- যেমন, কোনো ব্যক্তি একাই কাফেরদের সারিতে হামলা করে এবং তাদের ব্যূহ ভেদ করে একেবারে ভিতরে ঢুকে পড়ে। ...

- এমনিভাবে কোনো ব্যক্তি কাফেরদের অভ্যন্তরস্থ কোনো কাফের নেতাকে হত্যা করে। যেমন, চুপিসারে সুযোগ খুঁজতে লাগলো। যখন মনে করল যে তাকে হত্যা করতে পারবে, সকলের সম্মুখে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

- কোনো ব্যক্তির সকল সাথি পলায়ন করলো। তখন সে একাই বা ক্ষুদ্র একটি দল নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গেল। এ যুদ্ধে কাফেরদের কিছু ক্ষতি তো হবে, তবে মোটামুটি নিশ্চিত যে, তারা সকলে নিহত হবে।

চার মাযহাবের আইম্মায়ে কেরামসহ অন্য সকল ইমামের

মতে এ সকল সূরত জায়েয। কিছু ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন কয়েকটি মত ছাড়া এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। শাফিয়ি ও আহমাদসহ অন্যান্য অনুস্বরণীয় ইমাম সুস্পষ্ট বলে গেছেন যে, এগুলো জায়েয। আবু হানিফা ও মালেকসহ অন্যান্য ইমামের মাযহাবও এমনই। কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মাহর সালাফগণের ইজমা এর স্বপক্ষে দলীল।”- কায়িদাতুন ফিলইনগিমাসি ফিলআদুউ ২১-৩১

এর পর তিনি কুরআন সুন্নাহ থেকে এর দলীল পেশ করেন। সেখান থেকে সহজ কয়েকটি দলীল তুলে ধরছি। বিস্তারিত উক্ত রিসালায় দেখা যেতে পারে।

কুরআনে কারীম থেকে দলীল

ক. আল্লাহ তাআলার বাণী-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

“মানুষদের মাঝে এমন কিছু লোকও আছে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত বিক্রি করে দেয়। আল্লাহ তাআলা (এরূপ) লোকদের প্রতি অতিশয় দয়ালু।”- বাকারা

২০৭

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জীবন বিকিয়ে দেয়ার ব্যাখ্যা ইবনে তাইমিয়া রহ. এভাবে দেন,

وذلك يكون بأن يبذل نفسه فيما يحبه الله ويرضاه، وإن قتل أو غلب على ظنه أنه يقتل. اهـ

“তা এভাবে হবে যে, এমন পথে নিজের জীবন উৎস্বর্গ করে দেবে, যে পথ আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন ও যাতে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট- যদিও মৃত্যু নিশ্চিত হয় বা প্রবল ধারণা হয় যে, সে নিহত হবে।”- কায়িদাতুন ফিলইনগিমাসি ফিলআদুউ ৩২

আয়াতের শানে নুযূল থেকে বিষয়টি পরিষ্কার। ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

وقد ذكر أن سبب نزول هذه الآية
أن صهيبا خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلحقه المشركون وهو وحده. فنشل كنانته، وقال:

والله لا يأتي رجل منكم إلا رميته. فأراد قتالهم وحده، وقال: إن أحببتم أن تأخذوا مالي بمكة فخذوه، وأنا أدلكم عليه. ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

ربح البيع أبا يحي"".

وروى أحمد بإسناده: أن رجلا حمل وحده على العدو فقال الناس: ألقى بيده إلى التهلكة. فقال عمر: كلا بل هذا ممن قال الله فيه: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ} (البقرة:207) . اهـ

“আয়াতে কারীমার শানে নুযূল প্রসঙ্গে বলা হয়:

ক. সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাওয়ার জন্য হিজরত করে মক্কা থেকে মদীনায় রওয়ানা দেন। মুশরিকরা তার পশ্চাদ্ধাবন করে। তখন তিনি একা মাত্র। তিনি তূণীর থেকে তীর নিলেন। বললেন, আল্লাহর কসম, যে কেউ সামনে আসবে তাকেই বিদ্ধ করবো। তিনি একাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ইচ্ছা করলেন এবং বললেন, যদি আমার সম্পদ নিয়ে নেয়া (এবং বিনিময়ে আমাকে নিরাপদে হিজরতে যেতে দেয়া) তোমাদের পছন্দ হয়, তাহলে নিতে পার। আমি তা কোথায় আছে বলে দেব। এরপর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আবু ইয়াহইয়া! তোমার বিক্রি লাভেই

হয়েছে’।

খ. ইমাম আহমাদ রহ. নিজ সনদে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি একাই শত্রু বাহিনির উপর আক্রমণ করলো। তখন কিছু লোক বলতে লাগলো, লোকটি নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করেছে। তখন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু (তাদের কথা প্রত্যাখান করে) বললেন, কিছুতেই নয়! বরং সে তো ঐসব ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘মানুষদের মাঝে এমন কিছু লোকও আছে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত বিক্রি করে দেয়। আল্লাহ তাআলা (এরূপ) লোকদের প্রতি অতিশয় দয়ালু’।”- কায়িদাতুন ফিলইনগিমাসি ফিলআদুউ ৩১-৩২

খ. আল্লাহ তাআলার বাণী-

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“আল্লাহ্ মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে। অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে অধিক প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী কে আছে? সুতরাং তোমরা (আল্লাহর সাথে) যে লেন-দেন করেছো, তার উপর আনন্দিত হও। আর এটাই মহা সাফল্য।”- তাওবা **১১১**

আল্লাহ তাআলা যখন জান-মাল কিনে নিয়েছেন, তখন তা আল্লাহর হাতে সমর্পণ করতে হবে। **ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,**

فإن المشتري يسلم إليه ما اشتراه، وذلك ببذل النفس والمال في سبيل الله وطاعته، وإن غلب على ظنه أن النفس تقتل والجواد يعقر، فهذا من أفضل الشهادة. اهـ

“কেননা, ক্রেতা যা ক্রয় করেছে, তা তার তাতে সমর্পণ করে দিতে হবে। আর তা এভাবে হবে যে, জান-মাল আল্লাহর রাস্তায় ও তার আনুগত্যে উৎস্বর্গ করবে- যদিও প্রবল ধারণা হয় যে, তার প্রাণ সংহার হবে এবং ঘোড়া কাটা পড়বে।

আর এটাই শাহাদাতের সর্বশ্রেষ্ট পন্থা (যেমনটা হাদিসে এসেছে)।"- কায়িদাতুন ফিলইনগিমাসি ফিলআদুউ ৩৩

এরপর ইবনে তাইমিয়া রহ. বেশ কিছু আয়াত থেকে বিষয়টি প্রমাণ করেছেন। আলোচনা দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কায় আমরা সেগুলো এখন উল্লেখ করছি না।

(ইনশাআল্লাহ চলমান)

জিহাদে কাশ্মীর এবং বালআম বিন বাউরার উত্তরসূরিদের বিভ্রান্তির অপপ্রয়াস- ০৬

নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও মোকাবেলা করা জায়েয বরং প্রশংসনীয়

সুন্নাহ থেকে দলীল

ক. বদরের যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা ছিল তিনশোর চেয়ে কিছু বেশি, পক্ষান্তরে শত্রু সংখ্যা ছিল তিনগুণ বা তারও বেশি।

খ. উহুদ যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন সাতশোর মতো, পক্ষান্তরে শত্রু সংখ্যা ছিল তিন হাজারের মতো।

গ. খন্দকের যুদ্ধে কাফেরদের সম্মিলিত জোটে সৈন্য সংখ্যা ছিল দশ হাজারের অধিক, যা সাহাবায়ে কেরামের কয়েক গুণ।

ঘ. অনেক সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতেই কোনো কোনো সাহাবি একা একা কাফের বাহিনির উপর হামলা করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রশংসা করতেন।

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

فعلم: أن القوم يشرع لهم أن يقاتلوا من يزيدون على ضعفهم، ولا فرق في ذلك بين الواحد والعدد، فمقاتلة الواحد لثلاثة كمقاتلة الثلاثة للعشرة. اهـ

“বুঝা গেল, শত্রু বাহিনি দ্বিগুণের বেশি হলেও কিতাল জায়েয। এক্ষেত্রে একক ব্যক্তি জামাতের মাঝে কোন তফাৎ নেই। কেননা, এক ব্যক্তি তিনজনের মোকাবেলা করা তিন ব্যক্তি মিলে দশজনের মোকাবেলা করারই মতো।”- কায়িদাতুন ফিলইনগিমাসি ফিলআদুউ ৪৫

ঙ. আসিম ইবনু সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা। ইমাম বুখারি রহ. আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন,

بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم عشرة رهط سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهداة وهو بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فنفروا لهم قريبا من مائتي رجل كلهم رام فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدينة فقالوا هذا تمر يثرب فاقتصوا آثارهم فلما رآهم عاصم وأصحابه لجؤوا إلى فدفد وأحاط بهم القوم فقالوا لهم انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا .
قال عاصم بن ثابت أمير السرية أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر اللهم أخبر عنا نبيك فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في سبعة فنزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق منهم خبيب الأنصاري وابن دثنة ورجل آخر فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر والله لا أصحبكم

إن في هؤلاء لأسوة يريد القتلى فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه فانطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোয়েন্দাগিরির জন্য দশ সদস্যের একটি সারিয়্যা পাঠান। আসিম ইবনু সাবিত আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের আমীর নির্ধারণ করেন। তারা রওয়ানা হন। উসফান ও মক্কার মধ্যস্থ হাদআ নামক স্থানে যখন পৌঁছলেন, হুজাইল গোত্রের বনু লিহইয়ান কবিলার কানে তাদের সংবাদ গেল। প্রায় দু’শো লোক, যাদের প্রত্যেকেই দক্ষ তীরন্দাজ ছিল, তাদেরকে ধরার জন্য রওয়ানা দিল। ... আসিম রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তার সঙ্গীগণ যখন এদেরকে দেখলেন, একটি উঁচু স্থানে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। লোকেরা চতুর্দিক থেকে তাদেকে ঘিরে ফেলল। বললো, ‘নেমে এস। আত্মসমর্পণ কর। আমরা অঙ্গিকার করছি, তোমাদের কাউকে হত্যা করবো না’।

সারিয়্যার আমীর আসিম ইবনু সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘আর যাই হোক, আল্লাহর কসম! আজকের দিনে আমি কোনো কাফেরের আশ্রয়ে নামবো না। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সংবাদ আপনার নবীর কাছে পৌঁছে দিন’। এতে কাফেররা তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করলো। আসিম রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ সাতজনকে হত্যা

করল। বাকি তিনজন অঙ্গিকার মতো নিচে নেমে এলেন। খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইবনু দাসিনা রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আরেকজন। যখন কাফেররা তাদেরকে বাগে পেল, তাদের তীরের রশিগুলো কেটে দিল এবং তাদেরকে বেঁধে ফেল। তখন তৃতীয়জন বললেন, 'এই তো প্রথম গাদ্দারি। আল্লাহর কসম আমি তোমাদের সাথে যাব না। ঐসব (নিহত) সঙ্গীদের মাঝে গ্রহণ করার মতো আদর্শ আমার জন্য আছে (অর্থাৎ আমিও তাদের মতো শহীদ হয়ে যাব)'। কাফেররা তাকে টেনে হেঁচড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু তিনি কোনো মতেই গেলেন না। ফলে তারা তাকে হত্যা করে দিল এবং খুবাইব ও ইবনু দাসিনা রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে নিয়ে চললো। অবশেষে বদরের পর মক্কায় তাদেরকে বিক্রি করে দিল।"- সহীহ বুখারি ২৮৮০

দীর্ঘ হাদিস। এরপর খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করার ঘটনা এবং আসিম রাদিয়াল্লাহু আনহুর লাশ মৌমাছির দ্বারা সংরক্ষণের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

فهؤلاء عشرة أنفس قاتلوا أولئك المائة أو المائتين، ولم يستأسروا ثم لما استأسروا الثلاثة امتنع الواحد لهم حتى قتلوا منهم سبعة. من إتباعهم حتى قتلوه. اهـ

"এই যে এরা মাত্র দশজন লোক। ঐ একশো বা দুইশো লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। আত্মসমর্পণ করেননি। এভাবে তাদের সাতজন শহীদ হয়েছেন। এরপর যখন তিনজন আত্মসমর্পণ করলেন, একজন তাদের সাথে চলতে অস্বীকৃতি জানালেন, ফলে তারা তাকেও হত্যা করে দিল।"- কায়িদাতুন ফিলইনগিমাসি ফিলআদুউ ৫২

শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. (৪৯০হি.) বলেন,

ولا بأس بالصبر أيضا بخلاف ما يقوله بعض الناس إنه إلقاء النفس في التهلكة، بل في هذا تحقيق بذل النفس لابتغاء مرضاة الله تعالى، فقد فعله غير واحد من الصحابة - رضي الله عنهم -، منهم عاصم بن ثابت حمي الدبر، وأثنى عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك، فعرفنا أنه لا بأس به.اهـ

“ময়দানে টিকে থাকতেও কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু কতক লোক এর বিপরীত কথা বলে। তারা বলে, এটা না’কি নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার নামান্তর। তাদের কথা সঠিক নয়। বরং এ তো হচ্ছে বাস্তবিক অর্থেই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়া। অনেক সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম এমনটা করেছেন। হযরত আসিম ইবনু সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরই একজন। যাকে মৌমাছি দিয়ে হেফাযত করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কারণে তাদের প্রশংসা করেছেন। বুঝা গেল, এতে কোন অসুবিধে নেই।”- শরহুস সিয়ারিল কাবীর ১/ ৮৫

ইবনে তাইমিয়া রহ. এছাড়াও আরো দলীল পেশ করেছেন। আলোচনা সংক্ষেপণার্থে আমরা আর সামনে বাড়বো না। যতটুকু উল্লেখ করেছি, সত্যানুসন্ধানীর জন্য এতেই অনেক খোরাক আছে। হে আল্লাহ! আমাদেরকে সত্য বুঝার ও মেনে চলার তাওফিক দান কর!

(চলমান)

জিহাদে কাশ্মীর এবং বালআম বিন বাউরার উত্তরসূরিদের বিভ্রান্তির অপপ্রয়াস- ০৭

♣ ইলকাউন নাফস ইলাততাহলুকা

দুর্বলতার হালতে জিহাদ করাকে শায়খ ইলকাউন নাফস ইলাততাহলুকা তথা আত্মহত্যার নামান্তর এবং হারাম বলেছেন। এ ব্যাপারে আলহামদুলিল্লাহ আমরা এতক্ষণ যথেষ্ট আলোচনা করেছি। এবার শুধু ইলকাউন নাফস ইলাততাহলুকা- এর স্বরূপটা তুলে ধরার চেষ্টা করবো, যাতে পাঠকগণ বুঝতে পারেন যে, ইয়াহুদি চরিত্রের এসব আলেম কত ধোঁকাবাজ। শরীয়তের সুস্পষ্ট বিষয়গুলোকেও এরা কিভাবে বিকৃত করে যাচ্ছে।

ইলকাউন নাফস ইলাততাহলুকা প্রমাণ করতে তারা সূরা বাকার এ আয়াতটির অপব্যাখ্যা করে,

{ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}

“তোমরা (অকাতরে) আল্লাহর রাস্তায় (অর্থ-সম্পদ) ব্যয় কর। (অর্থ-সম্পদ আঁকড়ে ধরে) নিজ হাতে নিজেদেরকে

ধ্বংসের অতলে নিক্ষেপ করো না। আর ইহসান (সুকর্ম) কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহসিন(সুকর্মশীল)দের ভালোবাসেন।”- বাক্বারা: ১৯৫

আল্লাহ তাআলা বলছেন,

তোমরা যদি অর্থ-সম্পদ অর্জনের দিকে মনোনিবেশ কর, সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখ, কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদে তা ব্যয় না কর, তাহলে কাফেররা তোমাদের উপর বিজয়ী হয়ে তোমাদের ধ্বংস করে দেবে। জিহাদ ছেড়ে অর্থ-সম্পদের দিকে মনোনিবেশ করে নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। হযরত আবু আইয়ূব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে এ ব্যাখ্যাই বর্ণিত আছে।

ইমাম তিরমিযি রহ. বর্ণনা করেন-

عن أبي عمران التجيبي قال: "غزونا من المدينة نريد القسطنطينية , وعلى أهل مصر عقبة بن عامر - رضي الله عنه - وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأخرج

الروم إلينا صفا عظيما منهم وألصقوا ظهورهم بحائط المدينة فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر , فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم , فصاح الناس وقالوا: مه , مه؟ , لا إله إلا الله , يلقي بيديه إلى التهلكة فقام , أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - فقال: يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل , وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار , لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه , قال بعضنا لبعض - سرا دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أموالنا قد ضاعت , وإن الله قد أعز الإسلام , وكثر ناصروه فأنزل الله على , , فلو أقمنا في أموالنا , فأصلحنا ما ضاع منها نبيه - صلى الله عليه وسلم - يرد علينا ما قلنا: {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} فكانت التهلكة أن نقيم قال أبو عمران: فلم يزل .في أموالنا ونصلحها , وندع الجهاد أبو أيوب شاخصا يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية"

[جامع الترمذي: 2972]

“আবু ইমরান আত-তুজিবি রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কুসতুনতুনিয়ার জিহাদের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বের হলাম। তখন মিশরের গভর্নর ছিলেন হযরত উকবা ইবনু আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু। আমাদের জামাতের আমির

ছিলেন আব্দুর রহমান ইবনু খালেদ বিন ওয়ালিদ রহ.। রোমবাসী আমাদের বিরুদ্ধে তাদের বিশাল এক বাহিনী পাঠাল। তারা নগরপ্রাচীরকে পশ্চাতে রেখে যুদ্ধের সারি সাজালো। তাদের মোকাবেলায় মুসলমানদের থেকে তেমনই কিংবা তার চেয়েও বড় এক বাহিনী বের হল। মুসলমানদের এক ব্যক্তি রোমানদের বিশাল সারিতে একাই হামলা করে বসল এবং তাদের সারির একেবারে ভেতরে প্রবেশ করে গেল (যার ফলে তার মৃত্যু নিশ্চিত ছিল)। তখন লোকজন চিৎকার করে বলতে লাগলো- '(কি কর?) থাম! থাম! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! এ ব্যক্তি নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করছে।' তখন আবু আইয়ূব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, 'ওহে লোক সকল! তোমরা এ আয়াতের এই ব্যাখ্যা করছো? (তোমাদের ব্যাখ্যা সঠিক নয়।) এ আয়াত তো আমরা আনসারদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তাআলা যখন ইসলামকে শক্তিশালী করলেন, তার সাহায্যকারীও অনেক হয়ে গেল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অগোচরে আমাদের একে অপরকে বললো- আমাদের ধন-সম্পদ তো নষ্ট হয়ে গেল। এদিকে আল্লাহ তাআলা ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন। তার সাহায্যকারীও তৈয়ার হয়েছে অনেক। আমরা যদি (কিছু

দিন জিহাদ বন্ধ রেখে) আমাদের ধন-সম্পদের কাছে অবস্থান করে সেগুলোর পরিচর্যা করতাম (তাহলে ভাল হতো না?)! তখন আমাদের এই মতামতকে প্রত্যাখান করে আল্লাহ তাআলা তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ আয়াত নাযিল করলেন-

{وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}

"তোমরা (অকাতরে) আল্লাহর রাস্তায় (অর্থ-সম্পদ) ব্যয় কর। (অর্থ-সম্পদ আঁকড়ে ধরে) নিজ হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের অতলে নিক্ষেপ করো না।"

অতএব, ধ্বংসে নিক্ষেপ করার অর্থ- জিহাদ ছেড়ে আমাদের ধন-সম্পদের পরিচর্যায় লিপ্ত হওয়া।'

আবু ইমরান রহ. বলেন, এরপর আবু আইয়ূব আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু জিহাদ করতে থাকেন। অবশেষে যখন শহীদ হলেন, কুসতুনতুনিয়ায় তাকে দাফন করা হয়।"- জামে তিরমিযি: হাদিস নং ২৯৭২

পাঠক দেখুন! আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা কি আর দরবারিরা কি

ব্যাখ্যা করছে!!

***

খোলাসা

- ইসলামের শুরু যামানায় শত্রু সংখ্যা দশগুণ হলেও মোকাবেলা করা ফরয ছিল।

- দুর্বল হিম্মতের মুসলমানদের প্রতি লক্ষ রেখে আল্লাহ তাআলা এ সীমা কমিয়ে দ্বিগুণে নিয়ে এসেছেন। শত্রু সংখ্যা দ্বিগুণ হলে মোকাবেলা করতে হবে। এর বেশি হলে ফরয নয়।

- ফরয না হলেও মুস্তাহাব এবং আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়।

- উপরোক্ত আয়াত ইকদামি জিহাদের বেলায় প্রযোজ্য। দিফায়ী জিহাদের বেলায় শত্রু সংখ্যা যত বেশিই হোক, সামর্থ্যানুযায়ী মোকাবেলা করতে হবে। যেমনটা উহুদ ও খন্দকে আমরা দেখেছি।

- নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও মোকাবেলা করা এবং জীবন দিয়ে দেয়া জায়েয বরং আল্লাহ তাআলার কাছে প্রসংশনীয়। যেমনটা আসিম ইবনু সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তার সঙ্গী সাহাবাগণ করেছেন।

- শত্রুর ভয়ে জিহাদ পরিত্যাগ করা মুনাফিকি।

- নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও কিতাল করা ও জীবন দিয়ে দেয়া 'ইলকাউন নাফস ইলাততাহলুকা' নয়। 'ইলকাউন নাফস ইলাততাহলুকা' হল জিহাদ ও জিহাদে সম্পদ ব্যয় করা পরিত্যাগ করা।

***

কাশ্মিরিদের উপর জিহাদ ফরযে আইন

উপরোক্ত আলোচনার পর স্পষ্ট, বর্তমান কাশ্মিরের পরিস্থিতি খন্দক যুদ্ধের মতো। মুশরিকরা চতুর্দিক থেকে তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলেছে। এমতাবস্থায় তাদের উপর প্রতিরোধ ফরযে আইন। যে যেভাবে পারে প্রতিরোধ করবে। প্রতিরোধ

করতে গিয়ে যারা নিহত হবে তারা শহীদ বলে গণ্য হবে- যদি জাতীয়তাবাদি চেতনা না থাকে। যারা সামর্থ্যানুযায়ী প্রতিরোধ না করবে, তারা মদীনার মুনাফিকদের মতোই তিরস্কারের যোগ্য এবং ফরযে আইন তরকের গুনাহয় লিপ্ত। আর বহির্বিশ্বের মুসলমানদের উচিৎ সামর্থ্যানুযায়ী সহায়তা করা। এ ব্যাপারে শায়খের বিভ্রান্তির খণ্ডনে আমরা সামনে ইনশাআল্লাহ আলোচনা করবো।

জিহাদে কাশ্মীর এবং বালআম বিন বাউরার উত্তরসূরিদের বিভ্রান্তির অপপ্রয়াস- ০৮

♣ সংশয়.ক: আক্রান্তরা না দাঁড়ালে কি বাকিদের উপর ফরয নয়?

♣ সংশয়.খ: পার্শ্ববর্তীরা সহযোগিতা না করলে কি পরবর্তীদের উপর ফরয নয়?

ফিকহের কিতাবাদিতে এ দু'টি সংশয়ের জওয়াব এক জায়গায় বরং একই লাইনে দেয়া হয়েছে। আমরাও তাই

একসাথেই আলোচনা করবো।

সংশয়: শায়খ বলছেন,

- কাশ্মিরিরা যদি জিহাদে না দাঁড়ায়, তাহলে তাদের সহায়তার জন্য যাওয়া অন্য মুসলিমদের কোন দায়িত্ব নয়, বরং হারাম।

- কাশ্মিরিদের সহায়তা করার প্রথম দায়িত্ব পাকিস্তানের। তারা না করলে পরবর্তীদের জন্য সাহায্যে যাওয়া হারাম।

(লক্ষ্যণীয়, শায়খ কিন্তু কাশ্মিরিরা জিহাদে দাঁড়ালে নাজায়েয হবে বলেছেন। কারণ, ভারতের সৈন্য অনেক বেশি। আবার বলছেন, তারা না দাঁড়ালে বাহিরের মুসলমানরা যেতে পারেবে না। গেলে হারাম হবে। এক দিকে কাশ্মিরিরা দাড়ালে হারাম হবে, অপরদিকে বাইরের মুসলমান গেলেও হারাম হবে। ভিতর থেকেও জিহাদ হারাম, বাহির থেকেও জিহাদ হারাম। মুসলমানকে যাতাকলে পিষে ফেলার স্বপক্ষে এমন ফতোয়া মনে হয় কাফের বিশ্ব কমই পেয়ে থাকে।)

শায়খের এ দু'টো সংশয় দেখে বড়ই অবাক হতে হলো। কিতাবুল জিহাদের প্রথম দিকের কিছু পৃষ্ঠাও যাদের পড়া আছে, তারাও অবাক না হয়ে পারবে না। বুঝলাম না যে, আহকামুস সিয়ারের ব্যাপারে শায়খ কি আসলেই এতোটা অজ্ঞ? না'কি শায়খ উপরের নির্দেশে সত্যকে মিথ্যা বানাচ্ছেন? স্বার্থপরতা বা হুমকি ধমকি কি উম্মাহকে গোমরাহ করার পথে টেনে নিয়েছে শায়খকে? আল্লাহ মা'লূম। আমি প্রথমে ফিকহের কয়েকটি বক্তব্য তুলে ধরছি-

বিভিন্ন কিতাবের বরাতে আল্লামা ইবনু আবিদিন শামী রহ. (১২৫২হি.) বলেন,

الجهاد إذا جاء النفير إنما يصير فرض عين على من يقرب من العدو، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية عليهم، حتى يسعهم تركه إذا لم يحتج إليهم. فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان يقرب من العدو عن المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنها، لكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا: فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصلاة والصوم، لا يسعهم تركه ثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج. اهـ

“যদি শত্রুরা মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালায়, তাহলে (প্রথমত) জিহাদ ফরজে আইন হয় ঐসব মুসলমানের উপর, যারা শত্রুর সবচেয়ে নিকটবর্তী। আক্রান্ত এলাকা থেকে যারা দূরে অবস্থান করছে, (শত্রু প্রতিহত করতে) যদি তাদের সাহায্যের প্রয়োজন না হয়, তাহলে তাদের উপর জিহাদ (ফরজে আইন নয়; বরং) ফরজে কেফায়া। এ অবস্থায় তাদের জিহাদে শরীক না হওয়ার অবকাশ থাকে। তবে শত্রুর নিকটে যারা রয়েছে, তারা যদি শত্রু প্রতিরোধে অপারগ হয় বা অলসতাবশত জিহাদ না করে, তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যাবে; যেমন নামাজ-রোজা ফরজে আইন। তখন তাদের জন্য জিহাদ না করার কোনো অবকাশ থাকে না। এভাবে তার পরের এবং তার পরের মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে মাশরিক-মাগরিব; সমগ্র বিশ্বের সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়।”- রদ্দুল মুহতার: ৪/১২৪

আল্লামা ইবনু নুজাইম মিসরী রহ. (৯৭০ হি.) বলেন,

المراد هجومه على بلدة معينة من بلاد المسلمين فيجب على جميع أهل تلك البلدة، وكذا من يقرب منهم إن لم يكن بأهلها كفاية، وكذا من يقرب ممن يقرب إن لم يكن ممن يقرب كفاية أو تكاسلوا وعصوا وهكذا إلى أن يجب على جميع أهل الاسلام شرقا وغربا. اهـ

"এখানে উদ্দেশ্য হল, কোনো নির্দিষ্ট মুসলিম ভূখণ্ডে আক্রমণ। তখন সে এলাকার সকলের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যাবে। যদি তারা যথেষ্ট না হয়, তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর একই হুকুম বর্তাবে। যদি তাদের পার্শ্ববর্তী মুসলমানরাও যথেষ্ট না হয় অথবা (আল্লাহর) নাফরমানী করে অলসতা করে (জিহাদ না করে), তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর এই হুকুম বর্তাবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে পূর্ব থেকে পশ্চিম; সমগ্র বিশ্বের সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যাবে।"- আলবাহরুর রায়েক ১৩/২৮৯

আল্লামা ইবনে হাযম রহ. (৪৫৬হি.) বলেন,

ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأبوين إلا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يمكنه إعانتهم: أن يقصدهم مغيثا لهم . اهـ

“পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত জিহাদ বৈধ হবে না। তবে শত্রুরা কোনো মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ করলে তখন যে ব্যক্তিই তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম, তার উপরই ফরজ তাদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া।”- আলমুহাল্লা ৫/১২২

দাগ দেয়া অংশটুকু লক্ষ করুন-

- আক্রান্তদের ব্যাপারে ইবনে আবিদিন রহ. এর বক্তব্য: আক্রান্তরা ‘যদি শত্রু প্রতিরোধে অপারগ হয় বা অলসতাবশত জিহাদ না করে, তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যাবে; যেমন নামাজ-রোজা ফরজে আইন’।

- পার্শ্ববর্তীরা সহায়তা না করলে ইবনু নুজাইম রহ. এর বক্তব্য: যদি তাদের পার্শ্ববর্তী মুসলমানরাও যথেষ্ট না হয়

অথবা (আল্লাহর) নাফরমানী করে অলসতা করে (জিহাদ না করে), তাহলে তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর এই হুকুম বর্তাবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে পূর্ব থেকে পশ্চিম; সমগ্র বিশ্বের সকল মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যাবে'।

পরিষ্কার যে, আক্রান্তরা যদি অলসতা করে জিহাদ না করে তাহলে অন্যদের উপর ফরযে আইন। তদ্রূপ পার্শ্ববর্তীরা যদি অলসতা করে জিহাদ না করে তাহলে অন্যদের উপর জিহাদ ফরযে আইন। আর ইবনে হাযমের বক্তব্য তো আরো স্পষ্ট। যেই সহায়তা করতে সক্ষম তাকেই সহায়তা করতে হবে।

বক্তব্যগুলোর সাথে শায়খের বক্তব্য মিলেয়ে দেখুন। শায়খ কি এসব বক্তব্য দেখেননি? না দেখে থাকলে এ ব্যাপারে কথা বলার আগে অন্তত ফিকহের দুয়েকটি কিতাব পড়ে দেখার দরকার ছিল। আর যদি দেখে থাকেন, তাহলে তো স্পষ্টই ধোঁকাবাজি।

***